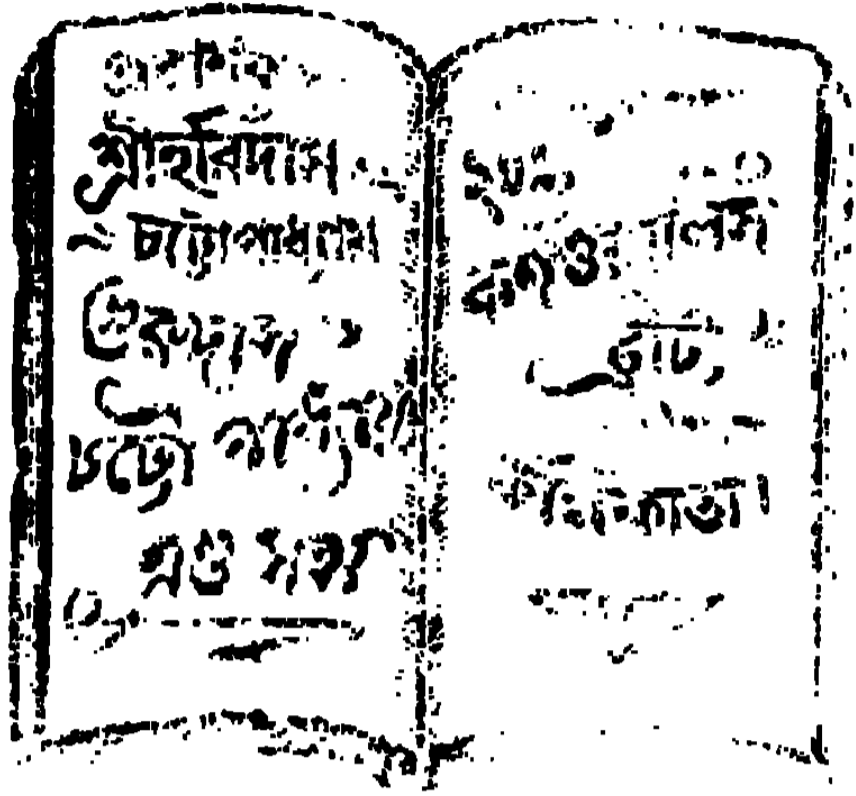


আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার অষ্টাদশ গ্রন্থ

নকল পাঞ্জাবী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত

আষাঢ়—১৯২০



তৃতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার-- শ্রীশরচন্দ্র চক্রবর্তী,

কালিকা প্রেস

২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন।

উপস্থাপনা

.....

.....

.....

.....

—প্রিয়জনকে উপহার দিবার—

কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| কুললক্ষ্মী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় | ... | ... | ২১ |
| শৈব্যা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় | ... | ... | ২১ |
| বিন্দুর ছেলে—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ... | ২১০ |
| মিলন-মন্দির—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য | ... | ... | ২১ |
| শশ্মিষ্ঠা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় | ... | ... | ২১ |
| বাণী—৩রজনীকান্ত সেন | ... | ... | ২১০ |
| বিনিময়—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য | ... | ... | ২১০ |
| মেজবউ—৩শিবনাথ শাস্ত্রী | ... | ... | ২১ |
| সফল-স্বপ্ন—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় | ... | ... | ২১০ |
| সাবিত্রী-সত্যবান্—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় | ... | ... | ২১ |
| সীতাদেবী—শ্রীজলধর সেন | ... | ... | ২১ |
| দত্তা—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ... | ২১০ |
| রূপের মূল্য—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় | ... | ... | ২১০ |
| কল্যাণী—৩রজনীকান্ত সেন | ... | ... | ২১০ |
| নারীলিপি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় | ... | ... | ২১০ |
| ভ্রমর—৩ধীরেন্দ্রনাথ পাল | ... | ... | ২১০ |
| উমা—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ... | ২১০ |
| বিরাজ-বৌ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ... | ২১০ |
| অগ্নি-সংস্কার—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম, এ, ডি-এল্ | ... | ... | ২১০ |
| রঙ্গমহাল—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় | ... | ... | ২১০ |

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

নকল পাঞ্জাবী

প্রথম প্রস্তাব

১

পঞ্চনদ ভূমি পাঞ্জাবের মোহিনী, গঙ্গার শতমুখচুম্বিত বঙ্গের অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণকারিণী কি না, জানি না। শাস্ত্র স্নিগ্ধ চল-চল অশ্রুসিক্ত বঙ্গের প্রকৃতি এবং রুদ্র কঠোর বীরগর্বে প্রদীপ্ত পঞ্চনদের পুরুষ পুরুষত্ব—উভয়ের স্বন্দে কে হারে, কে জেতে, একটা দেখিবার বিষয় বটে।

বঙ্গের কোল ছাড়িয়া পাঞ্জাবের ক্রোড়ে আসিতে অনেককে দেখিতেছি, কিন্তু পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া বঙ্গের কোল জুড়াইতে আসিতে অল্পই দেখা যায়। সুতরাং পাঞ্জাবেই জন্ম। এই কথায় হয় তো আমার বাঙ্গালী ভায়ারা মনে মনে আমার উপর বিষম চটিবেন। তাঁহারা যে শৈবালসঙ্কুল, পঙ্ক-পঙ্কপ্রাধার, মশক-ম্যালেরিয়ার জননী পুঙ্করিণীগুলিকে সরোবর আখ্যা দিয়া, জঙ্গলাকীর্ণ বাঙ্গালাকে কল্পনার স্বপ্নের দেশ গঠন করিয়া বলেন,— “এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো ভূমি”—আমি সে “স্বর্গাদপি গরীয়সী” মাতৃভূমির কথা বলিতেছি না। আপাততঃ আমি বাঙ্গালা দেশের কথা বলিতেছি, যেখানে পল্লীতে পল্লীতে ঘেঘ-হিংসা, দলাদলির স্বন্দসমাস, পালাজরের অক্ষয় নিবাস

এবং বার মাস প্লীহা ষকৃতেৱ চাৎ হুয়, আমি সেই মাটির বাঙ্গালার কথা বলিতেছি, “সোনার বাঙলা নয়,” এবং সেই সম্বন্ধেই বলিয়াছি, পাঞ্জাবের জয়!

এই জয় শেষ জয় কি না, না উহা পরাজয়েরই উদ্যম বিক্রম—পরীক্ষার বিষয় বটে। তবে সে পরীক্ষা বাহিরের নয়, অন্তরের। অন্তরজয়ীই প্রকৃত জয়ী। দেখা যাক, এই অন্তরযুদ্ধে কে প্রকৃত জয়ী।

২

পাঞ্জাব আমাদের জয় করিয়াছে—আমরা প্রবাসী পাঞ্জাবী। আজ এক পুরুষ নয়, দুই পুরুষ ধরিয়া আমাদের পাঞ্জাবে বাস। ইরাবতী শিখের গৌরবভূমি লাহোর নগরের আনারকালী গার্ডেনে—আনারকালী টুঙ্গর নিকটেই এক প্রস্তরনির্মিত ভবন আমার জন্মভবন—আমার গৃহ। লাহোর আমার শৈশবের মাতৃক্রোড়, লাহোর আমার বাল্যের ক্রীড়াভূমি, কৈশোর যৌবনের শিক্ষা-মন্দির। লাহোর-অধিবাসী আমার প্রতিবেশী, লাহোরের সঙ্গে আমি শত সংস্কারের সহস্র বন্ধনে জড়িত। সুতরাং কেহ যদি আমাকে লাহোরী অর্থাৎ পাঞ্জাবী বলিয়া ভুল করে, তবে তাহার বুদ্ধি এবং বিচারের দোষ দেওয়া যায় না।

লাহোরের প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েক জনেরই সঙ্গে আমার পরিচয়। বলিতে লজ্জা নাই, প্রবাসী বাঙ্গালী দেখিয়া বাঙ্গালীর সহিত পরিচয় করিবার এবং আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য আমার প্রাণ তত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না, এবং বোধ হয় তাহাদেরও তদ্রূপ একটা কিছু হয় না। আমার

ধরণ-ধারণ দেখিয়া আমার অপরিচিত বাঙ্গালীরা আমাকে পাঞ্জাবী এবং পরিচিতেরা আমাকে ‘পাঞ্জাবী ভাইয়া’ বলিয়া কৌতুকে সম্বোধন করিতেন। কেহ কেহ আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু আমি উহাতে না চটিয়া, তাহাদের বুঝাইয়া দিতাম—“In Rome one must do as the Romans do.”

৩

এ হেন পাঞ্জাবপ্রিয় যে আমি, সেই আমি যখন শুনিলাম, লাহোরের এক বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত প্রবাসী বাঙ্গালীর মেয়ে একটি খাসপাঞ্জাবী বিবাহ করিবার জন্ত একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তখন সেই ‘আমি’রও বিলক্ষণই ধৈর্য্যচ্যুতি হইল।

“শুনেছ মা ?”

“কি ?”

“মিঃ রায়ের আছরে নাতনীটি পাঞ্জাবী বিয়ে করিবার জন্ত ক্ষেপে উঠেছে।”

“যা—যা—বিরক্ত করিস্ নে, এখন আমার সময় নেই—পূজোর সময় হয়েছে।”

“ও মামুলী পূজা তো আছেই—একটা নতুন পূজোর কথা শোনাই না—পাঞ্জাবী পূজা—এমন কখনো শুনেছ ?”

“হরুনাংকে ডেকে ব’লে দে, গম্‌ওয়ালীকে ব’লে আসুক, কাল অন্ততঃ সের দশেক আটা পিষে দেয়।”

“তা তো দেবে,—তার আগে—এই বাঙ্গালী”—

“হাঁ রে, মোহিত এ কয় দিন ধ’রে আসছে না কেন রে ?

শরীর ভাল আছে তো? আজ সন্ধ্যার পর এখানে এসে খাবে, ব'লে আসিস্।—আহা, ছেলে মানুষ, এই বিদেশে একা!— কেন বাছা, দেশে কি আর এমন প্রফেসারি মেলে না! না, কোথায় বাঙ্গালা আর কোথায় পাঞ্জাব!

“পূজোর সময় যে উত্তীর্ণ হ'রে গেল!—মোহিতের জন্তে তো ভারী ভাবনা, এ দিকে সে বেচারী যে যায়—”

“কি, কি হয়েছে?”

“হবে আবার কি?—সেই কথাই তো বলছিলাম।—মিঃ রায়ের নাতনীটি—”

“কি হয়েছে?—মোহিত কি তাকে পড়ান ছেড়ে দিয়েছে?”

“সখের পড়া—আহুঁরে মেয়ে—বিবিয়ানা চং—খেয়ালি মেজাজ—”

“তা কি করবে? মেয়ের দোষ কি, মেয়েকে যেমন গড়েছে, তেমন হয়েছে।”

“তাহলে তোমারও ত তেমন হওয়ার কথা, কিন্তু তুমি তেমন না হ'য়ে এমন হলে কেন?”

“তোকে পাঞ্জাবী চং কে শেখালে?—যা, বিরক্ত করিস্ নে। হরনামকে ব'লে দে, আজ কিছু বেশী ক'রে ভাল দই আনতে। মোহিত দই বড়া বড় ভালবাসে, সে দিন যে কয়টা বড়া দিলুম, সবক'টি খেলে, আর ছিল না, তাই দিতে পারলুম না। মনটা কেমন করতে লাগল!—বাঙ্গালায় তো আর এমন হয় না—হাঁরে, তুই না ব'লেছিলি, মোহিতের সঙ্গে মিঃ রায়ের নাতনীর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে?”

প্রথম প্রস্তাব

“তা ব’লেছিলুম, এখন আর বলছি না।”

“মোহিত মেয়েটিকে কদিন ধ’রে পড়াচ্ছে ?”

“লাহোরে এসেই।”

“হুঁ—মেয়েটি কি পড়ে ?”

“ফিলজফি—ফিলজফি।”

“ফিলজফি !—খুব পণ্ডিত মেয়ে তা হ’লে।”

“পণ্ডিত-পাঞ্জাবী বিয়ে করতে চায়। তা কাশ্মীরী পণ্ডিত হ’লেও কতকটা মানতো।”

“তুই মেয়েটিকে দেখেছিস্ ?”

“মেয়েটি !—না—ধিন্গাটি বল—সে দিন ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল—রাইডিং ড্রেস্—রাইডিং ক্যাপ, চাবুক হাতে—ও কি, হাসুছ যে ?”

“বেশ তো।—পাঞ্জাবী বিয়ের কথা তোকে কে বললে ?”

“মোহিত বললে, আর কে বললে ?—একেবারে—ক্লেপে উঠেছে !”

“ওঁদের পরিবারে কে কে আছেন ?”

“কেউ নেই,—এক বৃদ্ধ মিঃ রায় আর তার আত্মরে নাতনীটি।”

“মা নেই ?”

“মা নেই—তাইতো মেয়ে এমন ধিন্গি হয়ে উঠেছে। বাপ অল্প বয়সেই মারা যায়, মাও ছোট মেয়েটিকে রেখে ধর্ম করতে তাঁর পিছু পিছু ছুটলেন—মাগুলো এমনিই হয়—তার পর বুড়ো

দাদাই নাতনীটির মা বাপ হয়ে এতদিন লালন-পালন ক'রে এত বড় ক'রে তুলেছেন।—”

“মিঃ রায়ের সঙ্গে বাবার পরিচয় ছিল, তাঁরা একই সময় বিলেতে যান। ছেলেবেলা মিঃ রায়ে আমায় কত কোলে পিঠে করেছেন।”

“বল কি! আর ওঁরা এত কাল লাহোরে আছেন, আর আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় নেই!”

“ওঁদের সঙ্গে তো আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক নেই। খুব ছোট বেলায় মিঃ রায়েকে আমাদের বাড়ীতে আসতে দেখেছি।

“আমাদের পরিচয় পেলে মিঃ রায়ে তাহ'লে নিশ্চয়ই খুব খুসী হবেন। এক দিন বুড়োর সঙ্গে আলাপ করতে হবে।— কি বল মা, তাতে দোষ কি?”

“না—দোষ কি।—তোর পাঞ্জাবী ঢং তো সেখানে চলবে না।”

“খুব চলবে।—যম্বিন্ দেশে যদাচার।—মা, আমি চল্লুম, মোহিতকে ব'লে আসিগে।”

“কিছু খেয়ে বেরো না।”

“না—না—একেবারে এসে তোমার সঙ্গে ব'সে খাব।”

৪

পাগড়ীটা ঝাধিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। বাতির হইয়াই দেখি, একখানা খালি একা ঘাইতেছে। উঠিয়া পড়িলাম। “চল—কলেজ্ বোর্ডিং।”

প্রথম প্রস্তাব

কলেজের বোর্ডিংয়েই মোহিত থাকে। একা বিদায় দিয়া বোর্ডিংএর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকিলাম। গিয়া দেখি, মোহিত ছাট্ কোট্ পরিয়া তৈরী।

“মোহিত বাবু!”

“এস ভাই, — ভাগ্যাস্—আর একটু পরে এলে আর আমার নাগাল পেতে না।”

“নাগাল তো তোমার পাওয়াই ভার। ভদ্রতা রক্ষা আছে, আবার কারুর কারুর মন রাখতেও যেতে হয়। সে যাক্, আজ একটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে কি?”

“সর্বকর্ম্ম পরিত্যাগ ক’রে।—কার নিমন্ত্রণ? তোমার?”

“না ভাই, আমার নয়, মা’র। তুমি সে দিন ভাল ক’রে ধেয়ে আসনি; মা বলেন, দই বড়া ছিল না ব’লে তোমার পেট ভরেনি; আজ তাই দই-বড়ার বিপুল আয়োজন। যাবে তো?”

“সে কি কথা! মা—তোমার মা কি আমার মা নয়?”

“কি জানি ভাই, কিন্তু দেখো, নিমন্ত্রণ-রক্ষায় তো মন-রক্ষার কোনো গোলযোগ হবে না?”

“সেখানে আপনিই গোল বেঁধেছে।—সে তো শুনেছ। পাঞ্জাবী বে’ করবার জন্য ক্লেপে উঠেছে।”

বলিয়াই মোহিত বুকের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। পত্রখানি নারীহস্তের লেখা, কিন্তু কিন্তু পুরুষে ছাঁদ। আমি সকৌতুকে পড়িলাম।—

“প্রিয়তম, তুমি আমার ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু ভালবাসা এক, বিবাহ স্বতন্ত্র। আমার দাদামণি এ কথা বুঝবেন না। তিনি উৎসাহে আমাদের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপাইতেছেন। তাঁহার বুঝিবার সময়ও নাই; তা না বুঝুন, তুমি আমি একমত হইয়া যে কাজ করিব, তাহাতেই তিনি সুখী হইবেন, এ কথা আমি ভাল রকম জানি। সে দিন Intermarriage সম্বন্ধে আমাদের যে কথা হইয়াছিল, তাহা আমি ভাবিয়া ঠিক করিয়াছি যে, আমাদের জাতীয় উন্নতির উহাই একমাত্র উপায়। কিন্তু উপায় বলিয়া তো নিশ্চিত থাকিলে চলিবে না; সেরূপ কাজ না করিলে কি হইবে? তুমি কি বল, যদি তুমি একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে বিবাহ কর, এবং আমি একজন পাঞ্জাবীকে বিবাহ করি, তাহ’লে আমরা অধঃপাতিত এই ষোর তমসাস্ফন্ন দেশকে জাগাইতে পারিব কি না? কি জানি কেন, এ উদ্দেশ্য এত মহৎ হইলেও আমার প্রাণের ভিতর কেমন কষ্ট বোধ হচ্ছে! আমরা দু’জনে ব’সে ব’সে কত সুখের ছবি এঁকেছি, কত সুখের স্বপ্ন দেখেছি, সে ছবি মুছে ফেলতে হ’বে! উঃ—ভগবান্ মানবহৃদয়কে এত দুর্বল করেছেন কেন? পুরুষ মানুষদের হৃদয় কি এমনি দুর্বল? না আমি মেয়ে মানুষ ব’লে, আমার এত যন্ত্রণা হ’চ্ছে? তুমি কি বল? আমার যত কষ্ট হ’চ্ছে, নিশ্চয়ই তোমার তত কষ্ট হ’বে না। আমি জানি যে তুমি অতি মহৎ, তোমার মত কজন আছে? আমি তোমার হাতে গড়া পুতুল, তুমি আমার বল দাও, নইলে আমি এ কঠিন কার্যে অগ্রসর

প্রথম প্রস্তাব

হ'তে পারব না—আমি স্বার্থ বলি দিতে পারব না। তোমাকে পাবার যে আকাঙ্ক্ষা, তোমাকে সুখী করবার যে সুখ, তোমাকে ভালবেসে যে আনন্দ, তুমি আমার—এ কথা মনে করতে যে গর্ব, আমি স্ত্রীলোক, তুমি না বল দিলে আমি কেমন ক'রে এ সব স্বার্থ বলি দিব? তুমি দাদামণিকে বুঝাইয়ো, তোমায় মনে করলে আমার মনে একটা তেজ আসে—জোর আসে। পারব না?—নিশ্চয়ই পারব। যদি আমি তোমার শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে না নিতে পারি, তার মত কাজ না করতে পারি, তাহ'লে আমি তোমার ছাত্রী হবার যোগ্য নই—স্ত্রী হবার তো নই-ই। আমার খালি একটা ভয় আছে, পাছে পাঞ্জাবী স্ত্রী তোমায় সুখী করতে না পারে। তা পারবে—পারবে—আমার মন বলছে—পারবে। তুমি অতি অল্পে তুষ্ট, তোমায় সন্তুষ্ট করা বেশী কথা নয়, নইলে আমি তোমার স্ত্রী হবার স্পর্শা করেছি কি ক'রে? এস, আমরা দুজনে স্বদেশের কল্যাণের মন্দিরে আপনাদের বলি দি। তা'তে তোমার মঙ্গল হবে—সত্য মঙ্গল হবে। আমি স্থির, এখন তুমিও আমায় টলাতে পারবে না। ইতি—”

আমার চিঠিপড়া শেষ হইতে না হইতেই বাহিরে “মোহিত বাবু আছ,” বলিয়া কে ডাকিল। মোহিত উক্ত ডাকে একে-বারে চমকিয়া উঠিয়া শশব্যস্তে আমার কানে “মিঃ রায়” বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

“এই যে আসুন, আমি এখনই যাচ্ছিলুম, আপনি কেন কষ্ট ক'রে এলেন?—আপনার যেমন কাণ্ড!”

“আর কাণ্ড !—দাদা, না এসে করি কি ? যে ক্যাসাদ বাধিয়েছে, স্থির থাকতে পারছি কই ?”

বলিতে বলিতে মোহিতের কাঁধে হাত দিয়া মিঃ রায় ঘরে ঢুকিলেন। পরিধানে সাদা ধানের ধুতি, সাদা শার্ট, তার উপর সাদা চাদর ব্যাপারের মত করিয়া গায় দেওয়া, পায়ে সাদা ক্যানভাসের জুতা, হাতে একগাছি আধমোটা সাদা আই-ভরি রঙের লাঠি। মিঃ রায়ের মুখখানিও তাহার পোষাকের মতন সাদা ধবধবে, তাহার উপর কোথাও কুটিলতার ছায়া নাই। কপালখানি প্রশস্ত উচ্চ, একেবারে অর্ধমস্তক-পরিবৃত টাকের সঙ্গে মিশিয়াছে। সেই টাকের পশ্চাতে পুরুকেশ, দুধের মতন সাদা, তাহাতেও কালোর ছায়া কোথাও নাই। চক্ষু দু’টি বৃহৎ, উজ্জ্বল, উহাদের কোণে কোণে ক্ষণে ক্ষণে একটু ঘেন রক্ত ও ব্যঙ্গের ভাব লুকোচুরি করিতেছে। নাসিকাটি পাতলা, লম্বা, তাহার নীচে ঠোঁট দু’খানিও পাতলা, তথা হইতে একটা অতি মধুর ব্যঙ্গের হাস্য তাহাকে কোন মতে চাপিয়া রাখিবার যো নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। ঠাকুরদাদার হৃদয়টি যেমন নির্জঞ্জাল, মুখখানিও তেমনি নির্জঞ্জাল—ধর ক্ষৌরচর্চিত।

আমি নমস্কার করিলাম। লাঠিটা আশ্বে আশ্বে দেয়ালের পায় ঠেস দিয়া রাখিয়া, দুই হাত জোড় করিয়া বৃহৎ আশ্রয় প্রতিনমস্কার করিলেন। তার পর চশমার ফাঁক দিয়া আড়নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া পরিষ্কার উর্দু মিশ্রিত হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপ্কে তবিয়ত্ আছা ?”

মোহিত মিঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাক্ষাৎ পরিচয় নাই না কি? ইনি আমার বন্ধু মিঃ টি, এন্স, মুখরাজ।”

মিঃ রায় একটু যেন বিস্মিত হইয়া বালিলেন,—

“মুখরাজ!—সে কি? পাঞ্জাবীদের এমন পদবী আছে নাকি?”

মোহিত হাসিয়া বলিল,—

“না ঠাকুরদা, এটি ঔর স্বকপোলকল্পিত। ইনি আমাদের মতোই বাঙ্গালী। চলিত কথায় ইঁহার নাম হচ্ছে, তারিণীশঙ্কর মুখুজ্জ্য।”

ঠাকুর-দা বালকের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

“মুখুজ্জ্য কি না মুখরাজ!—হা—হা—হা—তুমি যে আমার নাতনীটিকেও ছাড়িয়ে উঠলে দাদা? দেখি, দেখি, তোমার মুখখানি ভাল ক’রে দেখি।”

বলিয়াই বুড়ো আমার কৃষ্ণ শ্মশ্রু-ঢাকা চিবুকে হাত দিয়া বুড়ো ঠান্দিদির মতো মুখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আমাকে দোঁধতে লাগিলেন এবং অঙ্গুলি কন্নটির অগ্রভাগ দিয়া একটি চুমো খাইলেন। সে কি আনন্দ! বুড়ো একেবারে ভাবে গদগদ। তার পর আমাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে তাঁহার বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

এই এক আলিঙ্গনে আমাদের মধ্যে বয়সের তারতম্য একেবারে চলিয়া গেল। আমার মনে হইতে লাগিল, বুড়ো যেন সত্য সত্যই আমার ঠাকুরদা। আমি বলিলাম—

“আপনি আমাদের চেনেন না। কিন্তু মা আপনাকে জানেন। মার বাবার সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল। আপনারা একসঙ্গে বিলেতে যান। আমার দাদামশাইয়ের নাম—গৌরী শঙ্কর বাঁড়ুয্যো।”

“বটে, বটে—তুমি গৌরীর নাতি! সেই ছোট টুকটুকে লখিা মেয়েটি তোমার মা? তুমি ভাগ্যবান্ বটে, নইলে অমন লখিা মা পেয়েছ! ছেলেবেলা তাকে কত কোলে করেছি, কত আদর করেছি, তার কত আবদার আমার সহিতে হয়েছে!”

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ যেন সেই অতীতের অতল জলে ডুবিয়া গেলেন। সেখানে কত মণিমুক্তা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, কে বলিতে পারে? তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যখন পুনরায় আমার পানে চাহিলেন, দেখিলাম, তাঁহার সেই উজ্জ্বল চোখ দু’টি যেন ঘোলাটে। তিনি নারী-মূলভ অভিমান করিয়া বলিলেন,—

“এই লাহোরে তোমরা আছ, আর আমার সঙ্গে পরিচয় করনি?”

এই এক কথায় বৃদ্ধের হৃদয়খানি যেন আমার চোখের সামনে চিত্রের মত প্রতিভাত হইল। আমারও চোখ দু’টি ভিজিল। বলিলাম,—

“দাদামশাই, মা আজই আপনার কথা বলুছিলেন।” বোধ হয়, একেবারে তাঁহাকে ‘দাদা মশায়’ বলিয়া ডাকাতেই বুড়ো আনন্দে বিভোর হইয়া আমার আবার তাঁহার সেই অজস্র স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। বলিলেন,—“বলুছিল—

বল্ছিল! পাগলী কি বল্ছিল, বল তো ভায়া! বটে, বটে!
আমার কথা বল্ছিল! কি বল্ছিল, ভায়া, কি বল্ছিল?”

“বল্ছিলেন, ছেলেবেলা আপনি তাঁকে কত কোলে পিঠে
করেছেন”—

মিঃ রায় আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন,—

“আয় শালা, কান ম’লে দি আয়! তুমি একদিনও
আমার সঙ্গে দেখা করনি!”

“এই তো সবে আজ বল্ছিলেন, দাদামশায়!”

“কি বল্ছিলেন ভাই, কি বল্ছিলেন?”

“বল্ছিলেন, আজ আপনার নিমন্ত্রণ আমাদের বাড়ীতে।”

“তোমার মাকে সেই ছোট্টটা দেখেছি, এখন কেমনটা
হয়েছে, একবার দেখতে বড় সাধ হচ্ছে। কিন্তু দাদা, তুমি
আগে পরিচয় দিতে পারবে না। আমাকে তিনি এতদিন না
দেখেও যদি চিনতে পারেন, তবে আমার বড় আনন্দ হবে।
মোহিত আর আমি একসঙ্গে যাব।”

বলিতে বলিতে হঠাৎ যেন সে সরল হাসিতে একটু
গাঙ্গুর্যের ছায়া পড়িল। মোহিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

“না ভায়া, আমার যাওয়া হবে না।”

মোহিত জিজ্ঞাসা করিল,—

“কেন ঠাকুরদা?”

বৃদ্ধ বলিলেন,—

“ছেলেবেলা যাকে সোনার লক্ষ্মীপ্রতিমা দেখেছি, আজ
গিয়ে তাঁকে তপস্বিনী দেখব! দেখব তাঁর মাথায় সিন্দুর

নেই, হাত খালি ! ভাই, আমার সে সোনার প্রতিমাই ভাল, তপস্বিনী দেখে কাজ নেই !”

বলিতে বলিতে দুইটী বড় বড় ফোঁটা বৃদ্ধের কপোল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। আমার কঠোর পাঞ্জাবী বুকটাও গলিল। আমি তাঁর হাত ধরিয়া বলিলাম—

“তা হবে না দাদামশাই তোমায় যখন পেয়েছি, ছাড়ব না, যেতেই হবে।”

চোখের জলে, হাসিতে, মিঃ রায়ের মুখ ভরিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বালিলেন,—

“মোহিত, শোনো, শোনো, ছোঁড়া কি বলে, শোন। বলে, ছাড়ব না ! তোমার মা, এমনি ক’রে আমার হাত ধ’রে বলত ‘ছাড়ব না’ !”

“কথায় ভুলালে হবে না, দাদামশায়, যেতে হবে। যাবেন বলুন ?”

“ভায়া, ছাড়বনার আবদার যে দিন দাদামশায়ের প্রাণে পৌঁছুবে না, সে দিন জেনো, কোন কথাই আর তাঁর কানেও পৌঁছুবে না। স্নেহের আছ্রানে যেদিন তিনি সাড়া দেবেন না, সে দিন জেনো, তাঁর কণ্ঠও নিস্তব্ধ হবে। আর স্নেহের নিমন্ত্রণ যে দিন রক্ষা করব না, সে দিন জেনো, আর এক জায়গায় নিমন্ত্রণে এ হাটের দোকানপাট সব তুলুতে হবে। যাব বই কি, ভাই !”

তার পর মোহিতকে বলিলেন,—

“এখন যে জন্ত এত ভাড়াভাড়া এসেছি, বলি—”

“এখন বস্কার আগে এই চিঠিখানি একবার পড়ুন।”

বলিয়া মোহিত ঠাকুরদার হাতে তাঁহার নাত্নীর লেখা চিঠিখানি দিলেন।

চিঠি পড়িয়া ঠাকুরদা মোহিতের দিকে ফিরিয়া একটু গাশ্কার্যের সহিত হাসিয়া বলিলেন—

“এ তো জানি। এ হাস্যামা তো তুমিই বাধিয়েছ।” তার পর আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ভায়া, সব জানেন কি?”

আমি একটু মুচ্কে হাসিয়া বলিলাম—

“আজ্ঞে, এই কিছু কিছু।”

ঠাকুরদা বলিলেন;—

“বোঝার উপর শাকের আটা! কিছু কিছু উপর আমি আরও কিছু চাপিয়ে দি। আমার একটি নাত্নী আছেন, তার মা বাপ নেই। সে আমার বড় আদরের। তারও ঐ এক আবদার, —দাও, নইলে ছাড়ব না। যদি আমার তেমন বয়স থাকতো, দাদা, আমি তাকে ছাড়তুম না—পরের হাতে দিতুম না।”

মোহিত বলিল,—

“ঠাকুরদা, আমার কি পর ভাবেন নাকি?”

“আমি তো ভাবিনি ভাই, আপনার বলেই ভাবি, আরও আপনার করবার ফিকিরে ছিলাম, কিন্তু তুমিই যে হাস্যাম বাধিয়ে পর হয়ে যাচ্ছ।”

আমি বলিলাম—

“ঠাকুরদা, ও সব হেঁয়ালির কথা রাখুন এখন। ব্যাপারখানা কি, বলুন দেখি ?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার কি মত জানিনি ভাই, কিন্তু আমার মত, দাদা, তাদের ভাল রকম শিক্ষিত করা। এদিককার পড়াশুনা একরকম শেষ করিয়ে ফিলজ্জি শেখাবার জগে নাত্নীটিকে মোহিত ভায়ার হাতে দিনুম। ফিলজ্জি আমার বড়ই ভাল লাগে। বোধ করি’ আমার নাত্নীটিরও খুব ভাল লেগে থাকবে। নইলে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককেও ভাল লাগবে কেন ?”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—

“তবে আপনার নাত্নীর এইরূপ চিঠি লেখবার মানে ঠাকুরদা ?”

“মানে তো ভাই, ওরি ভেতরে প্রকাশ। তার মনে কোনো কোরকাপ নেই। চিঠিতে যা লিখেছে, মনেও তাই, নাত্নীটি আমার চিরকালই একটা না একটা খেয়াল, আব্দার নিয়ে আছেই। সেবার রেস্ (Race) দেখতে গেলুম; ধ’রে বসল,—সেও জকি (Jockey) হয়ে রেস্ খেলবে। ঘোড়ায় চড়তে অবশ্য শিখেছে, কিন্তু এই জকি-বাই বাধা দিতে আমার চুলে আরও একটু রং ধ’রে গিয়েছে। এখন যে ফঁাসাদে ফেলেছেন, সেটা কাটিয়ে উঠতে পারলে হয়।”

আমি বলিলাম,—

“সেবার তো রেস্ দেখে জকি-বাই উঠল, এবার পাঞ্জাবী-বাই উঠল কি থেকে ?”

ঠাকুরদা হাসিয়া বলিলেন,—

“সেটা দাদা, ভাষাকেই জিজ্ঞাসা কর ।”

মোহিত বলিল,—

“একদিন কথায় কথায় কথা ওঠে, Natural selection সম্বন্ধে । তাই থেকে Intermarriage question উঠলো । আমায় জিজ্ঞাসা কলে, Intermarriage এর কি ফল ? আমি বলিলাম, ‘জাতীয় উন্নতি—নৈতিক, মানসিক সব সম্বন্ধে ।’ শুনে আর কোনো কথা কইলে না, গুম্ব হ’য়ে বসে বসে ভাবতে লাগল ।”

ঠাকুরদা হাসিয়া বলিলেন—

“আর শ্রীমানেরও কপাল ভাঙ্গিল ।—ভাষা তো আমার নাত্নীকে ক্ষেপিয়ে চলে এলেন । আমি বেড়িয়ে বাংলার ফিরে গিয়ে দেখি, চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে । জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কিরে তোর হ’ল কি ?’ নাত্নী বলে, ‘Intermarriage’ . জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কার সঙ্গে ?’ সে আর কিছু বললে না । মনে করলুম, পড়তে পড়তে বা অমনি কি একটা ভাবছে । আমি খেতে বাড়ীর ভেতর গেলুম । ও রোজ আমার বসে খাওয়ায় । সে দিন—ও আর আমার কাছে গেল না, আমারও খাওয়াটা ভাল হ’ল না । ফিরে বাইরে এসে দেখি, বাগানের সামনে বারান্দায় অন্ধকারে চেয়ারে ঠায় বসে আছে । আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—‘শুবিনি ?’—বললে, ‘দাদা,

তুমি শোওগে, আমার দেবী আছে।’ আমি ওকে চিরকালই জানি—হাবড়হাটী কতকগুলো কি ভাবছে। জিজ্ঞেস করলুম, কিরে Intermarriage ভাবছিস না কি?’ একটু চম্কে উঠলো, বললে ‘হাঁ, দাদা। আমি আজই একটা ঠিক না ক’রে শোব না।—তুমি শোওগে, বুড়ো মানুষ কেন কষ্ট পাবে?’

আমি বলিলাম, তোর হয়েছে কি?’

“আমার যা হয়েছে, তা তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি শোওগে, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।”

“আমার ভুলিয়ে ভালিয়ে তো শুতে পাঠিয়ে দিলে। রাত দুপুরে ভায়া, ঘুম ভেঙ্গে দেখি, যে আমাদের সামনের বারাণ্ডায় যেন ছুটে বেড়াচ্ছে, ভয় হ’ল যে, বুঝি জকিবাই এখনও মেটেনি। তাই আপনা আপনি ঘোড়দৌড় কচ্ছে। আন্তে আন্তে বিছনা থেকে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলুম,—‘কি, ব্যাপার-খানা কি? বল দেখি?’”

বললে,—

“দাদা, মোহিত বাবুর সঙ্গে তুমি সব ঠিকঠাক করেছ, কিন্তু আমি মোহিত বাবুকে বে করতে পারব না।’

সত্যিই আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

বলিলাম,—

“সে কি রে, দিন ঠিক হয়েছে, আমি নিমন্ত্রণ-কার্ড ছাপতে দিয়েছি যে।”

বললে,—

“বেশ তো ঐ দিনই আমার বিয়ে দিয়ে। কিন্তু একজন পাঞ্জাবীর সঙ্গে !”

সেই ঘোর রাত্রি ; চারিদিক নিস্তরক ! ভায়া, নাত্নীটির মাথার ভিতর থেকে পাঞ্জাবীটা যেন ছুঁক্কার করে বেরিয়ে এলো ! আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—

“পাঞ্জাবী কি রে ? পাঞ্জাবী বিয়ে করাব কেন ?”

বললে,—

“দাদা, আমাদের বাঙ্গালী জাতটা বড় অধম হ’য়ে পড়েছে—এটা মান তো ?”

আমি আর কি করি, বললুম,—

“হঁ শুধু অধম ? অধম ধমাদম্ সব। তা দিদি, সেটাতো অনেক দিনের জানা কথা, তার গুণে রাতে বারাগুয় এত ছুটাছুটি করতে হবে কেন ? আমি খুব মানি।”

‘বাস্, তা হ’লে আর কি,—সবই তো বুঝেছি।’

আমি বলিলাম,—

‘ছাই বুঝেছি। তোর কথা গুলো সব খুলে বল।’

নাত্নী বললে,—

‘আমিই বা ছাই আর কি বেশী বুঝেছি। মোহিত বাবু আমায় ষেটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন, সেইটুকুই বুঝেছি।’

“ভাল, সেই ছাইটাকেই কি বুঝেছ দিদি শুনি ?”

বললে, ‘বুঝেছি যে পতিত জাতির শারীরিক ও মানসিক উন্নতি করতে গেলে প্রথম দরকার Intermarriage. আমি ঠিক করেছি দাদা, আমি একটি পাঞ্জাবী বে করব,

আর মোহিত বাবুর সঙ্গে একটি পাঞ্জাবী মেয়ের
বে দেব ।’

আমি বললুম,—

‘যা করবি যা দিবি, কাল সকালে যা হয় হবে, এখন তো
ঘুমবি চল ।’

‘না দাদা, যতক্ষণ না পাঞ্জাবী বিয়ে করছি, ততক্ষণ ঘুম
হবে না ।’

‘কি সর্বনাশ ! দিদি, আজ ঘুমবি চল আমি তিন দিনের
ভেতর তোকে বেড়ে দেড়ে খেড়ে পাঞ্জাবী বর এনে দেব । কি
করি, প্রতিজ্ঞা করলুম, যে, পাঞ্জাবী পাত্র এনে দেব, গ’ড়ে
পিঠে ঠিকঠাক করে নেওয়া তোমার হাত ।’

তাত্তে নাত্নী বললে,—

‘শুধু পাঞ্জাবী পাত্র হ’লে চলবে না একটি পাত্রীও চাই,
মোহিত বাবুর নইলে উপায় কি হবে ?—আমরা দুইজনেই
জাতীয় উন্নতির আদর্শ হব ।’

আমি কি করি, তখনই তারই গোড়ে গোড় দিলুম । খুব
উৎসাহিত হয়ে বললুম,—

‘হাঁ—হাঁ—পাঞ্জাবী নইলে কি আর বিয়ে ? আমি সব
যোগাড় করব ।’

নাত্নী বললে,—‘দাদা, বড় ঘুম পেয়েছে, শোবে চল ।’

এই পর্য্যন্ত তো তারা, হয়ে আছে, এখন উপায় কি
করি, বল ?

আমি বলিলাম,—

“উপায় তো অমনি হাল্ফিল্ ঠাওরানো যায় না, জানেন তো ইংরেজদের বড় বড় Question ডিনারএ (dinner) সেটেল (settle) হয়। সন্ধ্যার পর যা হয় একটা ঠিক করা যাবে। তখন মাও থাকবেন।”

ঠাকুর-দা এবং মোহিত, আমার প্রস্তাবে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, “বহুত আচ্ছা।”

৫

বাড়ী ফিরিতে আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে। আগিয়াই দেখি, মা উদ্বিগ্ন হইয়া পথের পানে চাহিয়া আছেন। আমি বাড়ী ঢুকিয়াই মাকে বলিলাম,—

“মা, মা, আমি আজ একটি সোনার খনি পেয়েছি।”

মা আমার এই হঠাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় হর্ষোৎফুল্ল মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন,—কি একটা কাণ্ড হইয়াছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

“সোনার খনি আবার তুই কোথায় পেলি?”

“মোহিতের ঘরে।”

মা হাসিয়া বলিলেন,

“সোনার খনি পাবার যায়গাই বটে! কথাটা খুলে বল। একে বেলা হয়েছে, তোর খাওয়া দাওয়া হয়নি, আমি উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি! সোনার খনি আবার কিরে?”

“দাদা মশাই গো, দাদা মশাই!”

মা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন,

“কে দাদা মশাই রে?”

“তোমার এক বাপ । ছেলেবেলা যার কোলে পিঠে উঠে ছ, বলছিলে ।”

“ওঃ মিঃ রায় ! তাই ভাল, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?”

“আ—লা—প ? মা, অমন মানুষ কি হয় ! তোমার নাম শুনে আর সেই সব ছেলেবেলাকার কথা মনে ক’রে বুড়োর চোখ ছল ছল করতে লাগল । আমাকে কাঁচ ছেলেটির মতো তার বুকের উপর টেনে নিলে ।”

“তুই তাঁকে আজ নিমন্ত্রণ ক’রে এলি । কেন ? সেই ছোট বেলায় দেখেছ, এখন দেখতে ইচ্ছে হয় !”

“কেন, তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে যাব কেন ? খামকা !”

“তোমার মতি গতি ধরণ ধারণ আমি বুঝতে পারি নে ।— এই সোনার খান, হীরের ধান, কত কি বল্লি, আর খাওয়ার বেলায় বুঝি সে কেউ নয় ?—এখন খা দা, বিকেল বেলা গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক’রে আসিস্ । তোকে অত ক’রে আদর করেছে !—”

“কি হিংসুটে মা তুমি ! আমাকে কখনু কি একটু আদর করেছে, অমনি তোমার মনে রিষ হয়েছে ; আর তুমি যে ছেলেবেলা তাঁর কত আদর খেয়েছ, আবদার ক’রে হাত ধরতে আর বলতে—‘ছাড়ব না’ !—দেখ মা, বুড়া যখন তোমার কথা বলতে লাগল, আমার মনে সত্যি মা একটু রিষ হয়েছিল । আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি ঐ বুড়া হতুম, আর আমার ছোট্ট মা-টী অমনি ক’রে আবদার করতো— ছাড়ব না !”

আমি বেশ দেখলুম, মা'র চোখ দুটি একটু চকচকে হ'য়ে উঠলো, কিন্তু মনের ভাব চেপে বললেন,—

“নে—নে—শীগীর খেয়ে নে। তার পর তাঁকে গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আয়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“তোমার পূজা সারা হয়েছে?”

মা বলিলেন,—“না। একটু জপ বাকি আছে।”

“তবে তাড়াতাড়ি উঠেছ কেন?”

“তোমার আস্তে দেরী হচ্ছে ব'লে স্থির হ'য়ে জপ করতে পারলুম না।”

মায়ের এক ছেলে হওয়া কি বিপদ! ছেলের দ্বারা এদের ধর্ম কর্মেও বিঘ্ন হয়। ছেলেই ইষ্টি, ইহকাল পরকাল—সব। আমি বলিলাম,—

“তা হবে না, তুমি জপ সেরে নাও। আমি যা বলেছি, তা করব—তোমার সঙ্গে ব'সে খাব।”

মা বলিলেন,

“ওমা! সে কি হয়! আমার এখন কত দেরী হবে। খাবি, দাবি, একটু জিরুবি তো, তা হ'লে তুই কখন তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে যাবি?”

আমি বলিলাম, “মা, নিমন্ত্রণ তাঁকে আমি ক'রে এসেছি।”

তার পর মা'র জপ সারা হইল, আমরা দুজনে আহারে বসিয়া গেলাম। বুড়ো ছেলে মায়ের সঙ্গে বসিয়া খাইতেছে—এটা বাঙ্গালার দৃশ্য, না পাঞ্জাবের দৃশ্য, না সমগ্র পৃথিবীর দৃশ্য—

কি করিয়া বলিব ? আমি প্রবাসী, আমার কথা আলাহিদা, আমি সকল নিয়মের বাহিরে ।

খাইতে খাইতে মাকে বলিলাম,—

“মা, একটা বড় অণ্ডায় কাজ ক’রে ফেলেছি ।”

শুনিয়া মার হাতের গ্রাস হাতে রইল, আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,

“কি করেছিস ? কোথায় মারামারি করেছিস না কি ?”

“না মা, না—সে ভয় নেই । আমি পথে বেরুলেই তুমি বুঝি ভাব, আমি মারামারি করি ।”

“তা বাছা, সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে একটু ভয় আছে বৈ কি, তোমার ছেলেমানুষী স্বভাবটি তো এখনও যায় নি ? আমার সঙ্গেই কত খুনসুড়ি কর ! কি করেছিস, বল দেখি ?”

“সে ক’রে ফেলেছি, আর তোমায় ব’লে কি হবে ?”

“না—না বল, বল—নইলে আমার ভাল ধাওয়া হবে না ।”

“দাদা মশাই তাঁর কথা তোমায় আগে বলতে বারণ ক’রে-ছিলেন । এত দিন না দেখেও তুমি তাঁকে চিন্তে পার কি না ।”

মা ফোঁস ক’রে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলিলেন,—

“বাছা, সে মুখ কি ভোলবার ? আমার বাবার মুখের সঙ্গে সে মুখ গাথা হ’য়ে আছে । লক্ষ লোকের মাঝখানে থাকলেও আমি তাঁকে চিন্তে পারতুম । তা তুই বলি কেন ?”

“বেশ, তুমিই যে কথায় কথায় আমার পেটের কথা সব বের ক’রে নিলে !”

“শোনো ছেলের কথা! আপনি ছুটে এসে বললেন,—
“সোনার খনি, হীরের খনি—কত কি?”

“তা মা, আমি তোমার কাছে কোনো কথা লুকুতে পারি না
আচ্ছা, পারি না কেন মা?”

মা একটু হাসিয়া বলিলেন,

“বাচ্ছা, কেন তা জানি নি, কিন্তু আশীর্বাদ করি, যেন
তোমার এমনি শিশুর মতো সরল মনটি বরাবর থাকে।”

“কেন মা, না থাকবে কেন?”

মা একটু ছুঁচু হাসি হাসিয়া বলিলেন,—

“যখন বে করবি, তখন কি আমি পর হব না?”

“মা, যদি তোমায় পর করতে হয়, এমন বিয়ে আমি
করব না।

তার পর কথায় কথায় দাদামহাশয়ের নাতনার কথা, তার
পাঞ্জাবী বর-বাই, মোহিতের মনভঙ্গ, ইত্যাদি সব কথা খুলিয়া
বলিলাম। তার পর মাঝে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“মা, তোমার বউ এসে যদি এমনি পাঞ্জাবী বে করবার
জন্তে ক্ষেপে ওঠে?”

মা হাসিয়া বলিলেন,—

“দূর মুখ! হাঁ রে, মোহিতের খুব দুঃখ হয়েছে না?”

“তা হবে না, মা?”

মা বলিলেন,—“কেন, কিসের দুঃখ? মেয়ে যা ধরবে তাই?
এখন যদি ধরে বসে, একটা ভূত বে করবে, তাই এমনি ভূত
এনে দিতে হবে না কি?”

“হঃ, তুমি তো জাননা মা, সে কি রকম আবদেরে এক
শুঁয়ে মেয়ে ! তার এক একটা বাই নিবৃত্তি করতে দাদামশাই-
য়ের মাথায় এক পৌচকরে কলি ফেরে ।”

মা হাসিয়া বলিলেন,—

“সে আবার কি ?”

“পাকা চুলে আরো পাকা রং ধরে গো ।”

“আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে, আগে তোর দাদা মশাই
খেতে আসুন ।”

আমি বুকিলাম, মোহিত সোভাগ্যবান্ । আমার মায়ের
সহানুভূতি সে পাইয়াছে ।

৬

“মুখরাজ !”

মা তখন খাবারের আয়োজন করিতেছিলেন এবং আমি
তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলাম । এমন সময় বাহির বাটী
হইতে ডাক আসিল,—“মুখরাজ !”

এই নামে আমাকে অনেকে ডাকে, কিন্তু এ ডাক শুনিয়া মা
যেন একটু সচকিত হইয়া উঠিলেন, স্বর যেন দূর হইতে আসিয়া
তাঁহাকে স্পর্শ করিল । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা, কে বল
দেখি ?”

মা একটু হাসিলেন । সে হাসিটা যেন চোখের জলে একটু
সরস । মায়ের গলাটাও একটু ভিজা ভিজা । বলিলেন, “ও গলা
কি ভোলবার ! কতদিন আগে ঐ স্বর আমার বাপের বাড়ীর
দরজায় আসিয়া আগে ‘মা’ বলিয়া ডাকিত, সেও এমনি মেহ-

মাথা । তুই আর দেবী করিস্নে, যা ঠাঁইঠুই করি, তুই তোঁর দাদামশাইকে ও মোহিতকে ডেকে নিয়ে আয় ।”

আমি ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম । আমাকে দেখিয়াই ঠাকুরদা বলিলেন,—

“কি হে কোন উত্তর দিলে না, মনে কৰোঁছলে বুঝি বুড়ো ডেকে ডেকে হায়রণ হয়ে চলে যাবে? এ তেমন পাত্তোর পাওনি ।—যাক্, আমার কথা সব বলেছ নাকি?—এঁয়া—সব মাটি ক’রে দিয়েছ! আমি রাস্তায় কত কথা মনে করতে করতে আসছি—”

আমি বলিলাম,—“ঠাকুরদা, আপনাকে কিন্তু ঠাকুরদা বলতে আমার ইচ্ছে করে না।”

“কেন বল দেখি।”

“ঠাকুরদা বলতে মনে হয় যেন সেই তেরকলে বুড়োটি! সত্যযুগের না হোক, অন্ততঃ ত্রেতার বটে!”

“ওরে শালা! আমি কি কালকের খোকাটি নাকি?”

“তা হোক, ঠাকুরদা, তোমার কথা মাকে ব’লোঁছি বটে। মার কাছে আমি কিছুই লুকাতে পার না। বলায় কিন্তু কোনো লোকশান হয়নি, ঠাকুরদা। মা তোমার আওয়াজ শুনেই চকিত হ’য়ে উঠলেন,—বললেন “ও গলা কি ভোলবার!”

“বটে বটে! চল—শীগগীর চল।”

“দাঁড়াও ঠাকুরদা, ঠাঁই হয়েছে কিনা দেখে আসি।”

“শালা, তুই তো কাল এসেছিস্! আমি এসেছি তোঁর অনেক আগে। আমার মাকে আমি জানিনে, তুই আমার

চিনিরে দিবি ? মায়ের কাছে আমার ঠাই সব সময় পাতা !”

কথা কহিতে কহিতে আমরা বাড়ীর ভিতর আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, মা ঠাই করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুরদা ঘরে ঢুকিবামাত্রই মা গলায় আঁচল দিয়া তাঁর পায়ের ধূলিগ্রহণ করিলেন। ঠাকুরদা মার মাথার হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন,—

“তুমি কেমন মা !—আমি যে পথে পথে মা মা করে কেঁদে বেড়াচ্ছি, তা একবার মনে কর্তে নেই ?”

মা মৃদু মৃদু হাসিয়া ঠাকুরদাদাকে বলিলেন,—“বসুন—মোহিত, বস—ধোকা !—”

“দেখেছেন ঠাকুরদা মায়ের আঁকল,—আমি এখনো ধোকা।”

মোহিত হাসিল, মা হাসিলেন, কেবল ঠাকুরদা না হাসিয়া বলিলেন,—

“ভায়া এত তাড়া কচ্ছ কেন ? বড় তো হবেই। যতদিন ধোকা হ’য়ে মায়ের কাছে আব্দারের দাবীটা রাখতে পার, ততদিন ভাল নয় কি ? আমার যদি মা থাকতেন, আর এই বয়সে আমার ধোকা ব’লে ডাকতেন, লোকে হাসতে বটে, কিন্তু আমি গিয়ে মায়ের আঁচল ধরতুম !—শালা ! ও তো বললে, ধোকা ; আমি যে বলব, আমার খুকীর ধোকা ! ভায়া, মাকে এখন থেকে বিশেষ করে আগ্লাও। আমি যখন এসেছি, মা নিয়ে দুজনে ঝগড়া হবে।”

আমি হাসিয়া উঠিলাম, কিন্তু মায়ের মুখে দেখিলাম, কি অপূর্ব শ্রী! উচ্ছ্বসিত মাতৃ-স্নেহে তাঁহার মুখমণ্ডল যেন পদ্মের মত ফুটে উঠেছে! মা হাসিয়া—সে হাসি কি মধুর!—বলিলেন,—“বাবা, খোকার সঙ্গে তোমার মা নিয়ে ঝগড়া আমি বেঁচে থাকতে তো আর মিটবে না! এখন ঝাবার জুড়িয়ে যায়, খেতে বস।”

আমরা আহারে বসিয়া গেলাম। মা পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

আহার করিতে করিতে ঠাকুরদা বলিলেন,—

“মা, তুমি বোধ হয় সব কথা শুনেছ! আর যে কয়টা দিন আছে, কোনো রকমে কাটিয়ে দেব ভেবেছিলুম, কিন্তু ভগবান্ দেখছি, কিছুতেই ছাড়ছেন না। লোকে দেখছে—হাসছি, খেলছি, বেশ মুখে আছি! মা, নাম যশ অর্থ মানুষ যা পায়, সবই পেয়েছি। মানুষ না বুকে চায়, পেয়ে কিন্তু পরে হায় হায় করে! যখন মা, চেয়েছিলুম, তখন বুঝতে পারিনি যে, চেয়েছি কতকগুলি জঞ্জাল। যে ভার বয়সে হেলায় ব’য়ে নিয়ে বেড়া-তুম, এখন সে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমিই বল দেখি, মা, আর কি এ বয়সে সংসারের বোঝা ব’য়ে বেড়াতে পারি? ভগবান্ সব বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়েছেন, একটি মাত্র রেখেছেন, এ বন্ধনটি এখন আর কারুর গলায় বেঁধে দিতে পারলে, আমি কর্তব্য দায় থেকে নিষ্কৃতি পাই। সব ঠিকঠাক হয়েও ছিল, কিন্তু আমার কপাল দোষে সব ওলটপাল্ট হ’য়ে গেল। কেবল কপালের উপর সব দোষ চাপিয়ে ঠিক খালাস হ’তে পারছি

কই? মনে হয়, আমিও অনেক ভুল ক'রেছি, একেবারে নির্দোষী নই।”

মা বলিলেন,—

“বাবা, ভুল ভ্রান্তি সবারই হয়। কেবল হায় হায় ক'রলে তো আর তার উপায় হবে না? ভুল হয়েছে যখন বুঝেছেন, এখনো দিন আছে, এখনো উপায় হ'তে পারে শোধ্রাবার।”

ঠাকুরদা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “উপায় যে কি হ'তে পারে, এখনো তো ঠিক করতে পারিনি মা।”

মা বলিলেন,—

“এমন কিছুই নেই, যার উপায় হয় না। যখন আমার এই দশা হ'ল, থোকা কচি ছেলে। কি হবে, কেমন ক'রে মানুষ ক'রে তুলব, ভেবে আকুল হ'য়েছিলুম। খাবার পরবার ভাবনা ছিল না, অবিগ্রি সে একটা প্রধান ভরসা, কিন্তু সেই ভরসাই আমার ভয়ের কারণ হ'ল। কে ঠাকিয়ে নেবে, টাকার জ্ঞে কত লোক শত্রু হবে, কত যে ভেবেছি, তা তো তুমি বুঝতে পাচ্ছ। কিন্তু বাবা, দেখ, জগদম্বার রূপায় থোকাকে তো এক রকম মানুষ ক'রে তুলেছি।”

ঠাকুরদা বলিলেন,

“শুধু মানুষ কেন মা, মানুষে মতো মানুষ করেছ।”

মা বলিলেন,

“বাবা তুমি জ্ঞানী, অনেক দেখেছ, আমি আর তোমাকে কি বলব! একটা বিপদ এলেই মানুষ আঁকু পঁাকু ক'রে হাল ছেড়ে দেয়।”

ঠিক সেই সময়ে মোহিতের দইয়ের বড়ার পাত্রও প্রায় শূন্য হইল। একটা মাত্র ছিল, মোহিত সেটি নিয়ে নাড়া চাড়া করছে। আমি বললাম,

“মোহিত, একেবারে হাল ছাড়তে হবে না। আমার মায়ের ভাণ্ডার অনূর্ণার ভাণ্ডার—ফুরোবার নয়।”

মা ‘তাই তো, তাই তো,’ বলে আবার পাত্র পূর্ণ করিয়া মোহিতকে বড়া দিলেন, ঠাকুরদাকেও দিলেন, কিন্তু আমাকে দিলেন না।

“মা।”

বলিতে না বলিতেই মা বলিলেন, “তুই আর খাসনে, অসুখ করবে।” ঠাকুরদা হাসিয়া বলিলেন,—

“ভায়া, তোমার কাছে হার মানলুম। হাঁ মা, খোকার অসুখ করবে, আর আমাদের শরীরগুলো বুঝি মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়নি! এগুলোর আর বুঝি সুখ অসুখ নেই।—তা যাক, এখন তোমার কথায় মা, আমার ভরসা হচ্ছে। কি উপায় করি, বল দেখি? হাঁ হে মোহিত, তুমি কিছু ঠাওরিয়েছ? না তুমি খালি গোল বাঁধিয়ে নিশ্চিন্ত, তার পর যা পারে, বুড়ো শালা করুক, আর মরুক।”

মোহিত বলিল,

“এর আর উপায় কি ঠাওরাব, ঠাকুরদা, তার যদি এতই মন হ’য়ে থাকে. পাঞ্জাবী বিয়ে করবে, তা’তে আমার বাধা দেবার দরকার কি?”

ঠাকুরদা বলিলেন,

“হা কপাল ! ‘মন হ’য়ে থাকে’ মন হ’লে ত বুঝতুম ;
এ যে খেয়াল ! মন তো মোহিত ; কিন্তু এতো তা নয়, এ যে
দেশের হিত ! তিনি নিঃস্বার্থ হ’য়ে দেশের হিতে আপনাকে
বলি দিচ্ছেন ।—তুমি নিঃস্বার্থ হ’য়ে তার সহিত আপনাকে বলি
দিছো ! তোমরা যে সকলেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লে !
একটা কিছু বিহিত কর ।”

মোহিত বলিল,

“তা কি করব ঠাকুরদা, ছেলেবেলা থেকে কখন কোনে
ইচ্ছায় কোনো বাধা তো পায়নি ? এখন বড় হয়েছে ।”

ঠাকুরদা বলিলেন,

“শুন্ছ মা, টিলটা কোন্‌দিকে আসছে, বুঝতে পাচ্ছ ?”

মা হাসিয়া বলিলেন,

“তা পাচ্ছি, বাবা, কিন্তু ও ছেলেমানুষ, ও আর কি বিহিত
করবে ?”

ঠাকুরদা মাথা নাড়িয়া বলিলেন,

“তা বটে মা, তা বটে কিন্তু মা. আন্তর্জাতিক বিবাহের
কথাটা তার কাছে না তুললে আর এত অস্বাভাবনাটা তো হতে
না ? সে থাক, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি কি ঠাওরাও—”

মা বলিলেন,—

“বাবা, তোমার আমি কি পরামর্শ দেব ? তবে ছেলে
যখন আঙুন নিয়ে খেলা করবার জন্তে পাগল হয়, তখন তার
হাতটা ধ’রে আঙুনের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয়
যে, তার তাত্ কত ।”

মায়ের কথার মর্ম আমি বুঝিলাম।

“ঠাকুরদা, হয়েছে! মা বলছেন যে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়ের মিল হতে পারে না—এইটে আপনার নাত্নীকে বেশ ক’রে বুঝিয়ে দিতে হবে। পাঞ্জাবীদের আচার ব্যবহার ধরণ ধারণের সঙ্গে আমরা ঠিক মিশ খেতে পারব না। এইটে যদি আপনার নাত্নী বুঝতে পারে তা হলে আর এ বাই থাকবে না।”

ঠাকুরদা টাকে বাম হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “উপায় তো বললে ভায়া, কিন্তু জোটপাট সব হয় কেমন ক’রে?”

আমি চিরদিনই কোতুকপ্রিয়, আমার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা মতলব গজাইয়া উঠিল। বলিলাম,—

“ঠাকুরদা, আমার একটি বন্ধু আছেন, খাস পাঞ্জাবী, একেবারে আহেলা বিলাত, আপনাদের বাঙ্গালায় যাকে বলে, ‘পাড়ার্গেয়ে ভূত’। সেই পাড়ার্গেয়ে পাঞ্জাবী ভূতটির শরণাপন্ন হতে হবে।”

ঠাকুরদা মুচ্কি হাসিয়া বলিলেন,

“তার পর? বলে যাও।”

“তার পর আর কি, ঠাকুরদা, তাকে দেখলে, পাঞ্জাবী বিয়ে তো নূরের কথা, আপনার নাত্নী একেবারে পাঞ্জাব থেকে ছুটে পালাবেন।”

মোহিতের মুখে চাহিয়া দেখিলাম, একটু আতঙ্কের ছায়া। তার কানে কানে বলিলাম,

“ভয় নাই, ভায়া ! সে খুব বিশ্বাসী, আমায় যদি বিশ্বাস করতে পার তো তাকেও পার ।”

ঠাকুরদার মুখে চাহিলাম, দেখিলাম তাঁর চক্রে এবং অধরে সেই রঙ্গ এবং রহস্যের হাসিটি ফিরিয়া আসিয়াছে । আমাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন,

“আচ্ছা ভায়া ! এ অকূল পাথারে তুমিই কাণ্ডারী ।”

আমি বলিলাম,

“স্বীকার । জাহাজ আমি ঠিক চালাব, কিন্তু আপনাকে একটি কাজ করতে হবে । সেই পাঞ্জাবীকে আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব, আপনি প্রস্তুত থাকবেন, আপনার নাত্নীর সঙ্গে পাঞ্জাবী ফ্যাসানে কোর্টশিপ হবে । আপনার নাত্নীকে প্রস্তুত করে রাখবেন ।”

ঠাকুরদা উৎসুক হইয়া বলিলেন,—

“কবে ভায়া, কবে ?”

আমি বলিলাম,

“পরশু । মোহিত থাকবে কি ?”

ঠাকুরদা মোহিতের মুখ নড়িবার পূর্বেই বলিয়া উঠিলেন,

“নিশ্চয় ! যে জোঁট পাকিয়েছে, তাকেই তো খুলতে হবে !”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

“ঠাকুরদা, আমার বন্ধুকে তো পাঠাব, কিন্তু আপনার নাত্নীর সম্বন্ধে একটু হৃদিস্ তাঁকে না দিয়ে দিলে হবে কেন ? আচ্ছা, এমনটা হ'ল কেমন ক'রে ?”

ঠাকুরদা বলিলেন,

“ভায়া, শোনো, আগাগোড়া সব বলি। ছেলে পাঞ্জাবে চাকরী করতো। আমার স্ত্রী মারা গেল, চাকরী থেকে অবসর নিলুম। আমার নিতান্ত নিকরপায় নিঃসহায় অবস্থা দেখে ছেলে জেদ্ ক’রে পাঞ্জাবে আনলে। আজ প্রায় বিশ বছরের কথা। বৌমার স্বল্প আমি কখনো ভুলব না। আমার কন্ঠাসত্তান নাই, সে আমার সে অভাব পূরণ করেছিল; কিন্তু সুখ আমার অদৃষ্টে নয় না! এই যে আমি এত স্মৃতিতে থাকি, দেখছ, সেটা কেবল জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি ব’লে। আমার এ স্মৃতি দুঃখের সঙ্গে ঝগড়া। দুঃখ যত আমার বুক চেপে ধরে, আমি এই স্মৃতির ফোয়ারা উড়িয়ে ভাসিয়ে দিই। বৌমার কাছে পাঞ্জাবে এসে দিনকতক বেশ রইলুম। আমার ছেলের চেয়েও বোমা আমার বেশী স্নেহ করতেন। কিন্তু তোমায় ব’লেছি তো, সুখ আমার নয় না। বছর দুই বেশ কাটল, তার পর ছেলেটিকে একদিন হারালুম। বোমা তখন আসন্নপ্রসবা; বোধ হয় গুরু শোকে সময়ের পূর্বে একটি কন্ঠাসত্তান হলো। তিনি সেটিকে আমার কোলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ’য়ে চোখ বুজলেন। তার পর যে কষ্টে পাঞ্জাবী দাই রেখে নাতনীকে মানুষ করেছি, সে আর তোমায় কি বলব! পাঞ্জাবীর মাই-দুখ খেয়ে নাতনীটি বেশ ছুটপুট বলিষ্ঠ হতে লাগল, আর স্বভাবটা হ’লো পুরুষ মানুষের মতো তেজী। একে এই, তারপর পুরুষ মানুষের সাহচর্যপালন! অন্য মেয়ে যখন পুতুল খেলা করে, এ তখন মার্কেল খেলে, লাটিম ঘুরায়। আমিই একমাত্র সঙ্গী, মেরেলি অভ্যাস হবে কোথা থেকে? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ঘুড়ি লাটাই, ব্যাটবল

হলো। তারপর ধোড়ায় চড়তে শিখতে চাইলে, শেখালুম। মাষ্টার রেখে দিলুম, মেয়েটার যেমন সাহস তেমনি বুদ্ধি, তবু তবু ক'রে শিখতে লাগল। আবার ভগবানের এমনি মার, যতই বড় হতে লাগল চোখ দুটো হ'ল বাপের মতো, গলার স্বর হ'ল মায়ের মতো। আমি এতে আমার ছেলে বো দু'জনকেই দেখতে পাই। যখন কথা কয়, মনে হয়, আমার বোমা কথা কচ্ছেন; যখন আমার মুখের উপর ডাগর ডাগর চোখ দু'টি তুলে চায়, আমার সেই ছেলেকে মনে পড়ে। ছেলেবেলা মেয়েদের মতন ক'রে কাপড় প'রত না; বু টি বেঁধে, মালকোঁচা মেরে যখন খেলত, আমার মনে হ'ত যে সে ব্রজের রাখাল। ক্রমে আরো বড় হ'ল, যখন বার বছর বয়স, তোমাদের মনে আছে কি না জানি না, এখানে একজন লেডি বেলুনিষ্ট এসেছিল, সে মাগী টিকেট ক'রে বেলুনভড়া দেখাত—পঁচিশ টাকা দিলে সঙ্গে নিয়ে একবার উড়াতো। আমি একদিন নাত্নীকে নিয়ে দেখতে গেলুম। উঃ—সে কি উৎসাহ! যেখানে গ্যাস্পোরা হচ্ছে, সেখানে যাচ্ছে, একবার আমার কাছে ছুটে আসছে; এটা কি, ওটা কি,—সে মাগীকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে ব্যস্ত ক'রে তুলেছে। মাগী কিন্তু ব্যাজার নয়, হাসছে আর তার কথার জবাব দিচ্ছে। আমার একজন বহুদিনের বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায় তাঁর সঙ্গে গল্প করছি, গল্পে গল্পে একটু অন্তমনস্ক হলাম, ও যে কোথায় কি করছে, খানিকক্ষণ ধোঁজ রাখতে পারিনি। হঠাৎ মনে হ'ল,—গেল কোথায়! তাড়াতাড়ি উঠে চারিদিক খুঁজে দেখি, কিন্তু কোথায়ও দেখতে পাইনি! আমি তো মহা

ব্যাকুল হ'য়ে ভাবছি, এমন সময় আকাশ থেকে আওয়াজ এল—‘দাদামণি, তুমি ভেবো না, আমি একটু বেড়িয়ে আসছি।’ উপর দিকে চেয়ে দেখি, বেলুনের কারু ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। আমি ধপ্ ক'রে একখানা চেয়ারে ব'সে পড়লুম। খানিকক্ষণ আমার আর কোনো চৈতন্য ছিল না। দেখতে দেখতে বেলুন অদৃশ্য হ'য়ে গেল, আমার মনে হ'ল, আমার এ সংসারের সঙ্গে যে একটু বন্ধন ছিল, তাও ঘুচল। বন্ধু আমায় ধ'রে গাড়ী ক'রে বাড়ী নিয়ে এলেন। প্রায় এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু কি রকমে যে কেটে গেল, তা আজও ভাবতে গেলে আমার কি রকম হ'য়ে যায়! তার পর “দাদা, দাদা,” বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, ‘কি মজা! কি আমোদ!’ তার পর আমার মাথার দিকে চেয়ে বললে, ‘দাদা, তুমি চূলে খড়ি মেখেছ কেন?’ আমি ভাড়াভাড়ি উঠে আয়নার মুখ দেখি, দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টার ভেতর আমার মাথার অর্ধেকের উপর চুল পেকে গেল, তার পর ছহ ক'রে টাক পড়তে শুরু করল। নাতনী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে যখন দেখলে, খড়ি নয়, তখন আমার কোলের উপর ব'সে চুপ্ ক'রে মুখ নীচু ক'রে খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তার পর আমার গালে হাত বুলিয়ে বললে, ঠিক যেমন ওর মা আমায় আদর করতো, ভোলাতো, তেমনি ক'রে বললে, ‘দাদা, তোমাকে না বলে আমি আর কখনো কোনো কাজ করব না।’ সেই থেকে দেখলুম যে, ওর সে বালক ভাব ঘুচে যেন প্রবীণা গিন্নী হ'য়ে পড়ল। সেই ওর মার মতন যত্ন ক'রে ব'সে থেকে

আমায় ধাওয়ায়, আমার কোনে বিষয়ে মন ধারাপ বা রাগ হ'লে
আদর কোরে ভোলায়। কি শক্তি ওর আছে, জানিনে, কিন্তু
কখন আমার গলা জড়িয়ে গালে হাত বুলুতে বুলুতে আবদার
করে, আমি 'না' বলতে পারি না। তবে যেখানে বিপদের
আশঙ্কা, সেইখানে আমাকে একটু শক্ত হ'তে হয়। তোমাকে
তো 'জকি' বাইয়ের কথা বলিছি!"—

আমি বলিলাম,—

“হাঁ ঠাকুরদা, সে সব তো শুনেছি। আপনি নিশ্চিত থাক-
বেন এ পাঞ্জাবী খেয়াল কেটে যাবে। যার হৃদয় আছে তাকে
শোধরানো শক্ত কথা নয়।”

৭

পরশু আসিল। সারাটা দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা সমাগত
হইল। ফাল্গুনের শেষ, শ্রুতরাং পূরোপুরিই বসন্ত। তবে
বাংলার বসন্তে আর পাঞ্জাবের বসন্তে ঢের তফাৎ।

কোকিলের কুহু কুহু, ফুরফুরে হাওয়া, ফুটফুটে জ্যোৎস্না,
যু ই বেলায় মিঠে মিঠে গন্ধ, ফিন্ফিনে বাসন্তী শাড়ী, এলোচুল
শুধু একটি ফিতে দিয়ে বাঁধা, সব শেষে টুকটুকে ঠোঁট—বাংলার
বসন্তের ইহাই মোট কথা। দিনে রাতে, প্রভাতে সন্ধ্যায়,
আলোক আঁধারে বাংলার বসন্ত অন্তরে বাহিরে বিরাজিত।

পাঞ্জাবে তা নয়। দিবসে গরম হাওয়া, রাত্রে শোঁ শোঁ
হাওয়া। প্রভাতে শান্তিনিক, দুপুরে দরজা-জান্না সব বন্ধ।
কুল—কুল ফোটে বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে—কখন শুকাইয়া
যাইবে। বসন্ত হেথায় অভিসার নয়, সংগ্রাম—কোমলে কঠোর।

প্রাচীন লাহোর বাদসাহী আমলের দিল্লীর একখানি ছোটখাট স্থিতি। বর্তমান লাহোর সে স্থিতিকে কতকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বাংলো, বাগান, আলো, রাস্তা, আফিস, কলেজ, চার্চ—এ সব দেখিয়া মনে হয়, একদিন লাহোর শুধু নামেই লাহোর থাকিবে। সে দিন পাঞ্জাবী আর পাঞ্জাবী থাকিবে না; নকলে আসলে মিলিয়া এমন একটা কিছু দাঁড়াইবে, যে খাস্ পাঞ্জাবের খাস্ পাঞ্জাবী প্রদর্শনীর জিনিষ বলিয়া গণ্য হইবে। সে শুভ দিন প্রায় সমাগত, সুতরাং আমরা সে শুভ দিনের সুযোগ গ্রহণ না করিব কেন ?

শুভ মুহূর্তে ‘ওয়া গুরুজীকা ফতে’ বলিয়া পাঞ্জাবী বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইবার পূর্বে বন্ধুকে অনেক তালিম দিলাম। কোর্টসিপ্ জিনিষটা তাহার জীবনের ইতিহাসে নূতন, আরও নূতন উহার অভিনয়। যে যাহা নয়, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে—ঠিকঠাক। চোর সাধু সাজিতেছে, কুটিল সরলতার অভিনয় করিতেছে, জঘন্যচরিত্র মহাপুরুষের অভিনয় করিতেছে। নকল আসলের নকল করিতেছে—সংসারের নিত্য নীলা। নিত্য নীলা—মন্দ ভালোর নকল করিতেছে। কিন্তু ভালোর মন্দের অভিনয় সংসারে কদাচ কখন চোখে পড়ে। যেখানে পড়ে, সেইখানেই অভিনয়ের কারিকুরি মারপ্যাচ সহজেই ধরা যায়। উহাতে চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়, কেননা, উহা নকলের নকলত্ব ধরাইয়া দেয়।

আমি সব্যসাচী, আমার বন্ধুকে বেশ করিয়াই তালিম দিলাম। আয়না আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিলাম।

আয়নার মুখ দেখিয়া সে নিজেই হাসিয়া আকুল। বন্ধুর হাসি দেখিয়া বুঝিলাম—ঠিক হইয়াছে। বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। লাহোরের প্রাচীন রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে বহুকালের জাঁর্ণ মলিন পাথরের বাড়া জ্যোৎস্নায় আরও কুৎসিত দেখাইতেছিল। শুনা যায়, জ্যোৎস্না রজনীতে এই সব জাঁর্ণ মলিন ভগ্ন অট্টালিকা এক অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়। কিন্তু সে কাবোর কথা, স্মরণ্য কথার কথা, কবিতায় আর বাস্তবে ঢের তফাৎ।

পাঞ্জাবীদের বেহায়া বেসুরা চাঁৎকার, একার ঝক ঝক ছড়-ছড় শব্দ, ফেরিওয়ালার বীভৎস আওয়াজ,—একটা তুমুল বেসুরা হৈ চৈ গোলমাল! রাস্তার ছ'ধারে ছোটখাট দোকান মলিন ধূলিপূর্ণ, কেরোসিনের মিটমিটে আলো চোপের মতন মিটমিট করিয়া চাহিতেছে। সে আলো হইতে অনর্গল ধূম উঠিতেছে, যেন আপনাকে ঢাকিতে পারিলে বাচে। একটা বিশ্রী গন্ধ খাবারের দোকানগুলি হইতে কেরোসিনের ধূঁয়ার গন্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত রাস্তাটাকে একটা বিশ্রী কাণ্ড-কারখানার আড্ডা করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু পাঞ্জাবী ভায়া মহা আনন্দে চলিয়াছেন। লোলুপ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে সেই সব ধূলিমালিন হরেক বকম বিদ্যুটে লাড্ডুমণ্ডিত খাবারের দোকানগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছেন। কণ্ঠে মৃদু মৃদু গান—

“খাও খাও নগরীয়া হামারী
চলবো কাঁয়সে ডগর্ নেহি জানী।”

তার পর ফাঁকা জায়গা। বর্তমান লাহোর। চাঁদ হেথায় হাসিতেছে, চাঁদের আলোতে সকল হাসিতেছে। ছোট বড় বাংলো—ফাঁক ফাঁক রাস্তার দুপাশে রেলিংঘেরা বাগান, বাগানে লতা পাতাগাছ সাজানো গোছানো। মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। কোন কোন বাংলোয় পিয়ানো সুরগান্ বাজিতেছে, আলোকে, সুরে, কল্পনায় গৃহের ছবি আরও মনোরম হইয়া শোভা পাইতেছে।

কিছু দূর এমনি গমনের পর বন্ধু তেমনি এক বাংলোর সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়াইয়া পড়িল। দুই পাশে দুইটি গেট। একটি গেট হইতে ভিতরে একটি কাঁকরবিছানো রাস্তা। একটি নাতি-বৃহৎ অগ্নাকৃতি লন্ বেঞ্চে করিয়া অপর গেটে আসিয়া মিশিয়াছে। সবুজ লন্, সুন্দর ছাঁটা। লনের পশ্চাতেই বাংলো, বাড়ী বৈদ্যুতিক আলোকে ঝলমল।

পাঞ্জাবী হাসিতে হাসিতে লন্ পার হইয়া ফুলের টবে সাজানো আলো-ঝলমল বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—

“বাবু!”

ঠাকুরদা নাত্নী এবং মোহিত সহ তেমনি আলোকিত হল-ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। ডাক শুনিয়াই বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাঁহার নাত্নীর পাত্রকে সাদরে কক্ষের ভিতর লইয়া গেলেন এবং মোহিত ও নাত্নীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন, “ইনিই পাঞ্জাবী পাত্র, বহু অনুসন্ধানে খুঁজিয়া অনেক সাধ্যসাধনায় বাঙ্গালী মেয়ে বিবাহ করিতে রাজিকরিয়াছি।”

তার পর নাত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

“দিদি, তুমি এর সঙ্গে পরিচয় কর।”

পাঞ্জাবী দেখিতে শুনিতে নিতান্ত মন্দ ছিল না। ‘দিদি’ স্মিত-নেত্রে তাহাকে দেখিতে দেখিতে ইংরেজি কেশা অনুসারে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিল। কিন্তু পাঞ্জাবীর সে দিকে হুঁস নাই। সে মুগ্ধ হইয়া দিদিকে দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে বলিল,—

“ইয়ে আসূলি রং কি নকলি ?”

ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—

“নোহি বাবু, নেহি। আসূলি রং, হাম্ পানিমে ধোকে দেখলানে সকতা।”

পাঞ্জাবী বলিল,

“হক্।”

দিদি সেক্হ্যাও না করায় অপ্রতিভ হইয়া হাত তো গুটাইয়া লইয়াছেই, আবার তাহার মুখের রং আসল কি ফলানো জিজ্ঞাসা করায় যে কি আশ্চর্য লাগিয়াছে, তাহা তাহার গণ্ডের রক্তিম আভা দেখিয়াই বোঝা গেল। চুপ করিয়া চেয়ারে বাসিয়া রহিল।

পাঞ্জাবী বলিল,—“হক্ ! মেয়া পছন্দ। রুপিয়া দেও।”

ঠাকুরদা বলিলেন,

“রুপেয়া ?—হাঁ—ও তো জরুর দেগা, সাদিকা পিছে।”

পাঞ্জাবী শির সঞ্চালন করিয়া বলিল, “নোহি, আধা আভি চাহি।”

নাত্নী জিজ্ঞাসা করিল, “কিসের টাকা, দাদামণি ?”

ঠাকুরদা বলিলেন,

“সে কথা তোমার শুনে দরকার কি, দিদিমণি ?”

“বল না, ব—ল—না ?”

ঠাকুরদা বলিলেন,

“এঁকে দশ হাজার টাকা দিতে হবে, তবে বাঙ্গালী বিষে করবেন।”

নাতনী বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

“দাদা, দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা অসভ্য ঙ্গলী—”

বলিয়াই জিভ্ কাটিল।

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“দিদি, টাকার কথা ছেড়ে দাও। যার সঙ্গে চিরকাল ঘরকন্না করতে হবে, তার পরিচয় আগে নাও,—নাম কি, জিজ্ঞেস কর না ?”

নাতনী জিজ্ঞাসা করিল,—

“আপ্কা নাম ?”

পাঞ্জাবী হাসিয়া বলিল,—

“হামারা নাম—পিয়ারী শঙ্কর।—তোমরা নাম ক্যা ?”

এইবার অসম্মানসূচক সম্ভাষণে সে মুখ লাল করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

নাতনী সুন্দরী বটে ! যেরূপভাবে চেয়ারে ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল, মনে হইল, যেন সিংহাসনে মহামাহিমাম্বিতা রাজ-রাজেশ্বরী।

পাঞ্জাবী বন্ধু কোন কিছু গ্রাহ না করিয়াই বলিল, “ক্যা তোমারা নাম ?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“বল না, দিদি, নাম বল—নাম বল। এখনি হয়তো চটে চ’লে যাবে!”

ঠাকুরদাই তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন,—

“ইস্কা নাম মিস্ বেলা রায়।”

পাঞ্জাবী হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। বলিল,—

“হা—হা—হা—বড় মজাদার নাম—হক্—হক্!—বিল্লী রায়—বিল্লী রায়—”

পাত্রী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। মোহিত এতক্ষণ স্বদূরে বসিয়া পাঞ্জাবী কীর্তি দেখিতেছিল। পাঞ্জাবীর এই কথায় ক্রমাল মুখে গুঁজিয়া খুক-খুক করিয়া কাসিতে লাগিল। তাহাতে পাত্রী আরও যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ঠাকুরদা বলিলেন,—“দিদি, ব’স।”

নাতনী বসিল। পাঞ্জাবী আবার বলিতে লাগিল,—

“মিস্ বিল্লী রায়—এ বড় মজাদার নাম—হক্!—কেঁউ? কুল্ মছাল খাতে হো!”

পাঞ্জাবী হাসিতে লাগিল। পাঞ্জাবী শুনিতে না পায়, এরূপ অস্ফুটস্বরে নাতনী বলিল,—

“তোমারা মুণ্ডো খাতে হো।” কিন্তু পাঞ্জাবীর তীক্ষ্ণ চক্ষু-কর্ণের কাছে কিছুই এড়াইল না। ঠাকুরদা যেন বিশেষ শঙ্কান্বিত হইয়া সেই সময় নাতনীর পাশে বসিলেন, এবং তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—

“দিদি, রেগো না, রেগো না; হাতছাড়া হ’লে আর এমন

সুপাত্র পাওয়া যাবে না। একে যেমন ক'রে হোক, পোষ
মানাতে হবে, ওকে খুসী ক'রে দাও, তা হলেই বস্।”

এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া নাত্নী নীচুস্বরে জিজ্ঞাসা
করিল,—

“টাকা কি তুমি দিয়েছ নাকি?”

“না, দিইনি, কিন্তু অর্ধেক এখনি দিতে হবে।”

নাত্নী বলিল,—

“হ্যাঁ—টাকা দিতে হবে, না ওর পিণ্ডি দিতে হবে!”

ঠাকুরদা যেন তাহা সামলাইয়া বলিতে লাগিলেন,—

“দিদি, তোমার একখানা গান গেয়ে ওঁকে খুসী ক'রে
দাও না?”

পাঞ্জাবী হাসিয়া বলিল,—

“হা—হা—হা—গান্—গান্‌ক্যা? অংরেজি বোলতা কেয়া
বাংলা বোলতা? হাম ভি খোড়া খোড়া বাংলা জান্তা,
অংরেজি ভি জান্তা। অংরেজি মে গান্ কো বোলতা—
কামানা”

নাত্নী হতাশভাবে পাত্রের মুখের পানে চাহিল। ঠাকুরদা
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন,

“গাও, দিদি, গাও,।”—

“হা—হা—হা, গো—গো—হামারা বহুত গো হাঁয় হক্।”

নাত্নী তেমনি চুপি চুপি বলিল,—

“হাঁয় তো তুই তাদের দল ছেড়ে এখানে মব্তে এলি কেন
রে মড়া?”—

পাঞ্জাবী বলিল,

“হাম্ মরা নেই—হাম্ জিতা—নাম পিয়ারী শকর—হক্
—আচ্ছা, তোমারা যো খুনী, ওসি বোলো, বিবি।”

নাতনী একটু চটিয়া বলিল,—

“দেখলে দাদামণি, দেখলে, আমায় বললে কি না বিবি?”

ঠাকুরদা একটু মুচ্কি হাসিয়া নাতনীর পিঠে হাত বুলাইয়া
বলিলেন,—

“দিদি, তুমি বিবির মতে: ফুটফুটে কিনা, তাই বলছে।”

পাঞ্জাবী বলিল,—

“হাঁ—হাঁ—হাঁ—বাইজীকো মার্কি ফট্ ফট্—হক্!”

“দাদামণি, শোনো, ওকে যদি টাকা দাও, আমি কুরুক্ষেত্র
করুব।”

পাঞ্জাবী বলিল,—“কা বোলতা?”

ঠাকুরদা বলিলেন, “আপকো দেখকে বহৎ খোস্ হো
গিয়া—ওহি বাৎ বোলতা।—দিদি, লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস
কর না?”

“আমার দায় পড়েছো তোমার গরজ হয়, তুমি কর।”—

পাঞ্জাবী বলিল, “ক্যা?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“মিস্ বেলা বোলতা হায়—”

পাঞ্জাবী বাধা দিয়া ধম্কাইয়া বলিল,—

“হক্ নাম বোলো—বিল্লি—মিস্ বিল্লি—কেয়া, মছলি খানে
মাংতা হায়?”

এই গরিহাস করিয়া পাঞ্জাবী বন্ধু এক গাল হাসিয়া ফেলিল।

ঠাকুরদা সকল দিক্ সামলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“আপ্‌কো পড়াশুনা কেত্‌নে তক্‌?”

“পরশুন ক্যা?”

ঠাকুরদা পরশুন্‌ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—

“আপ্‌কো বিদ্যা? যেস্‌কো লার্নিং বোল্‌তা?”

“হাঁ—হাঁ—হাঁ—হক্‌! (knowledge) নোলেজ—বহ্‌ৎ হায়—হক্‌! খেত্‌কা কাম্‌ জ্ঞান্‌তা—গৌ পান্‌তা—নৌ টান্‌তা—হক্‌!”

“ও মা, মুখপোড়া বলে কি, দাদামণি? বলে নৌ টান্‌তা! মিন্‌মে নৌকার মাঝি নাকি? তাড়াও, তাড়াও, দাদামণি, এখনি তাড়াও।”

“হাঁ—হাঁ—তানাও ভি হামারা হাঁয়—দৌ চারঠৌ হাঁয়—হক্‌—হঁয়া, বহ্‌ৎ মছালি হাঁয়, তোম্‌ খুব্‌ খাগা!—হক্‌। তোম্‌ বিল্লি হায়—হক্‌!”

“দাদামণি, তুমি কি একটা খুনোখুনি করবে? কি রকম হক্‌ হক্‌ করছে, বল দেখি।—আমি মোহিত বাবুর কাছে গিয়ে একটা কথা কইব।”

ঠাকুরদা টাকশুদ্ধ মাথা ঘুরাইয়া বলিলেন,—

“মোহিত তো কাছেই আছে, যখন ইচ্ছে কইতে পারবে, এখন এ যদি দেখলে চটে যায়।”

“ওর চটার কপালে আগুন! চোটে থাকে, ঘরের ভাত বেশী ক’রে খাবে!”

পাঞ্জাবী বলিল,—“নেই—ভাত হাম্ নেহি খাবে। কুল্ ডাল রোটা খাবে।”

সুর করিয়া—

মোট মোট ডাল রোটি

ছোট ছোট চানা

তাজ্জব কি কারখানা।”

বেলা অবাক্ হইয়া পাঞ্জাবীর মুখ চাহিয়াছিল, তাহার গান শেষ হইলে বলিল,—

“ও মা, কি হবে! ডাল্ কুটির নামে মিন্‌সের মুখ দিয়ে লাল পোড়্‌লো গা! রাম রাম, কি ঘেন্না! দাদামণি, তোমার পায় পড়ি, আমার হাত ছাড়—মোহিত বাবুর সঙ্গে একটা কথা কই।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—

“আর কি কথা? সেই পাঞ্জাবী মেয়ের কথা তো? আমি তো এখনো খুঁজে পাইনি, আচ্ছা এঁকেই জিজ্ঞেস করি না কেন?—বাবু পিয়ারী শঙ্কর, আপ্‌ কোই এসি লেড়কী কো জান্তা. বাঙ্গালীকো সাদী করে গা?”

পাঞ্জাবী টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া হাঁক ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—

“কাঁহে নেই—আল্‌বাৎ হোনে সক্তা—রুপেয়া সে সব্ হোনে সক্তা। রুপেয়া দেও, লেড়কী দেগা। হামরা ভ তিনঠো হাঁয়—”

“ও দাদামণি, শোনো শোনো, বলে তিনঠো লেড়কী আছে!”

“হাঁ—আছে তো বাইজী—হক্—হামারা পয়লা জরুকা—”

“ও দাদামণি, আবার পয়লা জরু, কি বলে? তুমি কি আমার হাত-পা বেঁধে জলে ডোবাবে? ওকে বিদেয় কর, বিদেয় কর।”

“হাঁ—হাঁ—বিণ্ডে কো বাৎ তো বহুৎ ছয়া—আউর ফিন্ বিদে বিদে, ক্যা করুতা?”

ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি বলিলেন, “নেহি বাবু, আপ্কে বিছাকা বাৎ শুন্কে মিস্ বেলা কা বহুৎ তাজ্জব লাগা—সোই বোলুতা।”

“আচ্ছা,—আচ্ছা—হক্। হাঁ—লেড়কী—হামারা পয়লা জরুকা একঠো, দোসরা জরুকা দোঠো—”

“ও আমার কপাল! মিন্‌সে কি গাঁ শুদ্ধ বে করেছে না কি? তবু আবার বে করবার জন্মে এসেছে! কাঁটা মার, কাঁটা মার—”

পাঞ্জাবী বলিল,—“নেই—বুট নেই—হক্” বলিয়াই পাঞ্জাবী আঙ্গুল গণিতে গণিতে বলিল,—

“একঠো ছয় বরষ্ উমর, একঠো তিন বরষ্, আউর একঠো দো। ছয় বরষ্‌কা ছয় হাজার রুপেয়া, তিন বরষ্‌কা আন্তে লেগা তিন হাজার, আউর দো বরষ্‌কো আন্তে দো হাজার।”

“দাদামণি, তোমরা দরদস্তুর করুতে থাক—”

“হাঁ—হাঁ—হাঁ—হক্—এই সি দস্তুর—এই সি দস্তুর। যেৎনা বরষ উমর, ওৎনা হাজার রুপেয়া।”

“দাদামণি, আমার ছেড়ে দাও। মোহিত বাবু, তোমারা সন্নে আমার কথা আছে।”

দাদা যেন একটু রাগ করিয়াই বলিলেন,—

“তুই তো বড় মজার দেখছি! আমি সাধ্যসাধনা ক’রে আনলুম, এখন তুমি চললে? তা হবে না, আজ ওঁকে এখানে ধাওয়াতে দাওয়াতে হবে, তোমাকেই যত্ন খায়ত্তি করতে হবে।”

“আর খাবে কি, দাদামণি আমাকেই খেতে এসেছে! মোহিত বাবু! তুমি উঠবে কি না, বল?”

পাঞ্জাবী ষাড় দোলাইয়া বলিল,—

“উঠ—হামারা ভি উঠ—হায়—খুব ছুটতা—হক।”

“আমার মাথাগোড় খুঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে! কথা বোঝে না, একে এনেছে বিয়ে দিতে?”

“সে কি দিদি, আমার দোষ? তুমিই তো পাঞ্জাবী পাঞ্জাবী করলে? আপনি ক্ষেপেছ, মোহিতটাকেও ক্ষেপিয়েছ! ও এখন আবদার নিয়েছে, পাঞ্জাবী মেয়ে না হলে বিয়েই করবে না।”

শুনিয়া বেলা ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

ঠাকুরদা বলিলেন,—“কি বল দিদি, ঐ ছ’ বছরেরটাই নেয়া থাক!—মোহিত, কি বল?”

মোহিত গম্ভীর হইয়া বলিল,—

“আমি আর কি বলব? আমি এত দিন যে আশা পোষণ করেছিলুম, তা তো নিশ্চূল হয়েছে! যার জন্তে আমি সব করতে পারি, তাকে সন্তুষ্ট করা আর কি বেশী কাজ! সে যেন আমার মুখ চাইলে না, কিন্তু আমি তো তা পারব না। সে যাতে সুখী হয়, তাই করবো।”

বলিয়া মোহিত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি বিবগ্ন

হইয়া বসিয়া রহিল। বেলার চোখ ছুটিতে যেন একটু ছলছলে ভাব দেখা গেল। কিন্তু কেবলমাত্র বলিল,—

“মোহিত বাবু, তুমি কি ক্ষেপেছ?—দাদামণি, তুমিও ক্ষেপেছ! আমি অন্তায় বায়না নিয়েছি ব’লে, তোমাদের তাই করতে হবে? আমি যদি এখন বলি, আমায় বিষ এনে দাও, আমি ধাব—”

“নেই বিল্লি বিবি, নেই—বিস নেই—ওহি ছয় হাজার মে হো যাগা।—হক্।”

“মোহিত বাবু, তুমি বুঝতে পারছ না? মিসের আক্কেল নেই, কি শোনে কি বলে—মাথামুণ্ডু—”

“ক্যা?”

“ওই শোন, থেকে থেকে ক্যা ক্যা করছে, আর হক্ হক্ করছে।”

ঠাকুরদা টাকে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—

“কি করবে দিদি, তোমার যেমন খেয়াল!”

“দাদামণি, তোমার পায় ধরছি, আর তোমার কথার অবাধ্য হব না, তুমি ও মিন্‌সেকে তাড়াও।—ছিঃ—বলছে বিল্লি—বিল্লি—বিল্লি—আমার নামের উপর ষেরা ধরিয়ে দিয়েছে।”

বলিয়া মিস্ বেলা অতি সক্রমণ নেত্রে মোহিত বাবুর মুখপানে চাহিয়া সহসা উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—

“মোহিত বাবু, দাদামণি পাগল হয়েছে।—তুমি আমার রক্ষা কর।”

মোহিত বলিল,—“বেলা, আমি রক্ষা করবার কে? যদি সে

অধিকার আমার দিতে, আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর্তুম—
তোমার পায় কাঁটাটি ফুটতে দিতুম না। কিন্তু এখন আমি কে,
বেলা? এখন যে তোমায় রক্ষা করবে, সে ওই।”

বেলা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মোহিতকে বলিল,—

“আমায় ক্ষমা কর!”

মোহিত তেমনি একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—

“আমি ক্ষমা করবার কে?”

“তুমি কে!—তুমি সব। আমি যদি একটা ভুল বুঝে থাকি,
তুমি কেন আমার শাসন করলে না, ধম্‌কালে না? মোহিত
বারু, আমার সর্বনাশ হ’তে বসেছে, আর তুমি চূপ্‌ ক’রে ব’সে
আছ? দাদা আমার দুঃখ বুঝে না, উনি এতো দুঃখ পেয়ে-
ছেন, আর দুঃখ ধরবার স্থান ওঁর হৃদয়ে নেই, তাই উনি হেসে-
খেলো নেচে-কুঁদে বেড়ান, আমি কি বুঝি নি? কিন্তু তুমিও কি
বুঝবে না।”

“বোঝাবুঝি তো ফুরিয়েছে, বেলা।”

“কেন ফুরিয়েছে?—কিছু ফুরায় নি! তুমি আর একবার
বল, তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।”

“আমি আর বলবার কে? যে বলবে, সে তো তোমার
সামনে উপস্থিত, আমি তোমার কে?”

“অভিমান করেছ? আমার তিরস্কার কর, পদাঘাত কর,
কিন্তু আমার ভাসিয়ে দিয়ো না। তুমি আমার কে! আচ্ছা,
আজ তুমি এ কথা বললে, কিন্তু এই বুঝে কি থাকতে পারবে?
ভাল, তাই ধরলুম, তুমি অভিমানে পাষণ হয়েছ!—তুমি আমার

কে ? ভাল, তাই, তুমি আমার কেউ নও, কিন্তু আমি কি তোমার কেউ নই ? আমি ছেলেবেলা থেকে মা জানিনি, বাপ জানিনি, জানি কেবল দাদামণিকে আর তোমাকে ! আমার একটা খেয়ালের কথায় রাগ ক'রে আমায় ভাসিয়ে দিচ্ছ ! কিন্তু এ খেয়ালের প্রশ্ন কে দিয়েছিল, কারা দিয়েছিল ? আজ তুমি বলছ, তুমি আমার কে ? ভাল, তুমি আমার কেউ নও ! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার কেউ নও, আমিও কি তোমার কেউ নই ? যাকে হাতে ক'রে গড়ে তুলেছ, একদিনে তার সঙ্গে সম্বন্ধ উঠিয়ে দিলে কি এমনি করেই উঠে যায়—বল বল—আমি তোমার মুখে শুনতে চাই।—বল—আমি তোমার কেউ নই !—আর তোমার বিরক্ত করব না—দাদামণিকে বিরক্ত করব না—আমি চ'লে যাব—আর কাউকে মুখ দেখাব না।”

মোহিত অধোবদনে বসিয়া রহিল। ঠাকুরদা অধোবদনে চক্ষের জল মুছিতেছেন।

পালা তো এক রকম শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ করিয়া এখান থেকে বিদায় নিতে পারুলে হয়। পাঞ্জাবী বন্ধুর যা কাজ, সে তো তা সম্পন্ন করিয়াছে।

ঠাকুরদা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—

“দিদি, রোস্—এটাকে আমি যে রকমে পারি, বিদায় করি।”

পাঞ্জাবীকে বলিলেন,—“মিস্ বেলা আপ্‌কো পছন্দ নেহি কর্তা।”

পাঞ্জাবী চটিয়া উঠিয়া বলিল,—“তব্ মোফৎ কাঁহে হাম্কে
বোলায়া ? রূপেয়া লেকে তব্ উঠে গা।”

বেলা বলিল,—“দাও, দাও,—ঠাকুরদা, যা চায়, দাও, দিয়ে
শীগ্গীর শীগ্গীর বিদেয় কর।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—“দেখিস্ দিদি, পাঞ্জাবী খেয়াল ছাড়্ বি
তো ?”

বেলা বলিল,—“দাদামণি, যে নমুনা দেখিয়েছ, পাঞ্জাবী কি,
পাঞ্জাব শুদ্ধ ছাড়্তে রাজি আছি।”

ঠাকুরদা পাঞ্জাবীকে বলিলেন,—“আচ্ছা, রূপেয়া আপ্কে
পিছে ভেজে গা—কেৎনা মাঙ্তে হো ?”

“হামরা সাথ সাদী নেহি দেগা ?—আচ্ছা, গান শোনাও,
নেহি তো হাম নেহি উঠে গা নেহি চলে গা—আলবাৎ সাদী
করেগা—” বেলা তাড়াতাড়ি বলিল,—

“দাদা, যদি মিন্‌সে গান শুনালেই বিদেয় হয়, তা আমি
এখুনি গাচ্ছি—” বলিয়াই বেলা কক্ষের অপর পার্শ্বে টেবিল-
হারমনিয়মে গিয়া বসিল।

এই অবসরে ঠাকুরদা মৃদু হাসিয়া সক্রতজ্ঞ নয়নে আমার
দিকে চাহিলেন। আমিও তেমনি হাসিয়া তাঁহার চাহনির
প্রত্যুত্তর দিলাম।

হারমনিয়ম বাজিয়া উঠিল। বেলা মোহিতের দিকে এক-
বার চাহিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিল—

নারী হ'লে বুঝ্‌তে নারীর মন,

অনাদরে কত সহে, বুকে বাজে কি বেদন !

কাতর প্রাণে মুখের পানে চায়,
নীরবে ধারা ব'য়ে যায়,
নীরবে আঁধি বলে, রাখ রাখ পায় ।
সয় ব'লে কি সওয়াতে হয়, হয় !
ভালবাসার এত খোয়ার
আগে কি জানি এমন !

.....

দ্বিতীয় প্রস্তাব

১

গভীর রাত্রে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—

“শোনেওয়ালো জাগতে রহো!”

কে এ? কাকে জাগায়? কেন জাগায়? এ ধ্বনি তো শুনিতে পাই, প্রতিরাত্রেই উঠে, কিন্তু জাগে কয় জন?

“শোনেওয়ালো জাগতে রহো!”

আমি তো জাগিয়াছি, তবে আবার কেন বলে?—

“শোনেওয়ালো জাগতে রহো!”

সে কি জাগরণ? মানুষ নিত্য ঘুমায়, নিত্য জাগে, এ কি সে জাগরণের কথা বলিতেছে না? এ বুঝি বলিতে চায়—
শোনেওয়ালো জাগতে রহো—মোহ-নিদ্রায় আর ঘুমাইয়ো না,
কাল-চোর সর্বত্রই ফিরিতেছে!—

“শোনেওয়ালো জাগতে রহো!”

এমনিতর কতকগুলো চিন্তা আমার মাথার ভেতর উলটি-পালটি ধাইতে লাগিল। কিন্তু এরূপ চিন্তা করিবার বয়সও আমার নয়, আর চিন্তাটাও বড় আরামপ্রদ নয়। আমি মায়ের ছেলে, মা'র কোল জুড়িয়া থাকিব, চিরদিন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইব, আবার ঘুম পাইলে মায়ের কোলে আসিয়া শুইব, তা

তোমার কাল-চোরই আশুক আর খাঁটি চোরই আশুক, আমি
খোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু বেটার কি সর্বনেশে হাঁক গো!
ঐ, আবার হাঁকে—

“শোনেওয়ালো জাগতে রহো!”

আমি একলক্ষ শয্যা হইতে উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া
পাহারাওয়ালোটোর গলার উপরও সপ্তমে সুর চড়াইয়া হাঁকি-
লাম—

“ঘুম্নেওয়ালো নিদ্ যাও।”

পাহারাওয়ালো আমার হাঁকের টানে একেবারে আমার
বারান্দার কাছে আসিয়া মস্ত এক সেলাম চুকিয়া বালল,—

“বারু সাব, নিদ্ যাই তো রুটি ক্যায়সে মিলে?”

এ তো বড় বিপদ দোধতেছি!—ঘুমাইলে বলে—জাগতে
রহো, আর ঘুমাইতে বলিলে বলে—রুটি ক্যায়সে মিলে? তবে
কি যত জাগাজাগি সব পেটের জন্তু? আমাদের সকল কাজই
কি এই পেটের জন্তু? জীবনের কি আর কোনো উদ্দেশ্য নাই?
কেবল ‘ঋণং কৃত্বা স্তুতং পিবেৎ’?

একসঙ্গে এত চিন্তা আমার কোনো কালে অভ্যাস নাই।
মাথার ভিতর ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া
দেখি, রাত্রিও ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে—বলে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে?
কা’কে ডাকিতেছে? আমাকেই ডাকিতেছে নাকি? কেন
ডাকিতেছে? আমাকে ওর কি দরকার? নাঃ—আজ মা
ষেরূপ জোর ক’রে ক্ষীরের পিঠে-খাইয়েছেন, বুঝি সেই জন্তুই
পেট গরম হয়েছে, তাই এমন আবোল-তাবোল নানা কথা মনে

উঠছে, তার উপর আবার নিষ্কর্মা জীবন। আচ্ছা, একটা কিছু করলে হয় না? একটা হৈ-চৈ—যা হয় একটা কিছু? কিন্তু এই নিশুতি রাত, সব চুপ্-চাপ্ নিস্তরক, সমস্ত লাহোর ঘুমাই-তেছে, পথের আলোগুলোও যেন ঝিমাইতেছে! এমন নীরব নিশীথে হৈ-চৈয়ের চিন্তা মনে বড় স্থান পায় না। চারিদিক্কার জমাট বাঁধা নিস্তরকতা যেন জেঁকে এসে আমার বুকের উপর বসে! ওঃ—দিনের বেলা কি হড়হড়ানি, ষড়ষড়ানি, কি চৈচা-মিচি, খোঁচাখুচি, হৈ-চৈ! আর এখন সব অশোরে ঘুমুচ্ছে। যেন এ জগৎ সে জগৎ নয়! এ কোন্ স্বপ্নরাজ্যের মাঝখানে আমি সজাগ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি? মানবজীবন কি বিচিত্র! জীবন বিচিত্র, মন আরো বিচিত্র!—আর মনে মনে কি বৈচিত্র্য! ঘৃণা, হিংসা, আশা, তৃষা, ভালবাসা—এ সব কি? কোথা থেকে আসে, কেন আসে? আসে তো আসে, তার জন্তে আমার এত মাথাব্যথা কেন? নাঃ—কাল রাত্রে ওটমিল (Oat meal) ব্যবস্থা করব। খেলে পেট ঠাণ্ডা থাকবে, শরীরে বলও হবে, স্নুনিদ্রা হবে—এমন হাবড়হাটি ভাবতে হবে না। এ কি বিপদ! ঝিম্-ঝিম্ কচ্ছেই। এরাও ঝিম্-ঝিম্ কচ্ছে, আর আমারও মাথার ভেতর ঝিম্-ঝিম্ কচ্ছে! হাঁ—কি ভাবছিলুম আশা, তৃষা, ভালবাসা। এ সব না হলে কি মানবজীবন ব্যর্থ? আমি তো মা'র কোলে বেশ স্নুখে আছি—সত্য, একটা ভালবাসা চাই; হয় আমার মা'য়ের মতন ভালবাসা, নয় মোহিতের উপর বেলার যেমন ভালবাসা। আচ্ছা, ও ভালবাসা কি রকম? অনেক দিন হয়ে গেল, সেখানে যেতে কি খবর করতে পারিনি। আমার খমু দেখাতে লজ্জা

করে, নির্কোষ বালিকাকে যে রকম ক'রে ঠাকিয়েছি!—যদি চিন্তে পারে? পারলেই বা, মন্দ তো কিছু করিনি! ভালই হয়েছে। কিন্তু ও ভালবাসাটা কি রকম? মা ছেলেকে ভালবাসে,—একে বলে বাৎসল্য, বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে—তাকে বলে সখা, আর স্বামী-স্ত্রী, প্রণয়ি-প্রণয়িনীতে যে ভালবাসা—সেটাকে বলে দাম্পত্য।—বাবা! নামটা খুব ঘোরালো বটে! কিন্তু তার দামটা কি? আমি তো কিছুই বুঝি না, আমার বোঝবার দরকারও নাই, আমি মার কোলেই থাকব। আবার!—ঐ ডাকে—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্! তোরা কে রে বাবু? আমাকে কি দুমুতে দিবি নি নাকি?—মৎলবটা কি?—হাঁ, ভালবাসাটা কি রকম! নায়ক-নায়িকাতে দেখা হ'ল, আর এ বললে—‘আমি তোমার’, ও বললে—‘আমিও তোমার।’ এ কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করি? খামাকা বললে, ‘আমি তোমার’ আর অমনি তোমার হয়ে গেল? কে বাবু, তোমার সাতপুরুষের কুটুম? রক্তের টান নেই, আজন্ম দেখা-শুনা নেই, চোখোচোখি হ'ল আর অমনি মুখোমুখি হয়ে ব'সে বুলি আওড়াতে শুরু করলে—প্রাণনাথ, প্রাণপ্রিয়সী! এ সব কি সত্যি, না মিছে? এ কি সব অভিনয় করে? নাটক, থিয়েটার? হাঁ, আলোচনা করবার মতো কথা বটে! মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কা'র ভালবাসা বড়?—মায়ের ভালবাসা, না বৌয়ের? মোহিতের বিয়ে হওয়া অবধি মা আমাকে ভারি পেড়াপিড়ি করুছেন—বে কর, বে কর। কেন? কি দরকার? খামাকা মুস্থ প্রাণকে ব্যস্ত করা কেন?

মায়ে-ছেলেতে একটা বোঝাবুঝি হয়ে গেছে, আবার নূতন একজনকে এনে তার সঙ্গে নতুন ক'রে বোঝাপড়া কর ! সে কি মায়ের মতন ভালবাসতে পারবে ? তাও কি কখনো হয় ! কা'ল মাকে জিজ্ঞানা করুব, মা কি বলে । যেমন পেড়াপিড়ি কচ্ছে, তেমনি এক কথায় চূপ করিয়ে দেব । আর কথখনো বিয়ের কথা মুখে আনবে না ।—আবার ডাকে, কিম্ব কিম্ব কিম্ব —কম্বু গে তোরা কিম্ব কিম্ব—আমি শুই গে । কে একজন কিম্ব কিম্ব শুনে পাগল হয়ে গিয়েছিল. দিন-রাত লাঠি-হাতে দূরে বেড়াতো আর বলতো “ছুতোর—কিম্ব-কিম্ব—কিম্ব কিম্ব বংশ নিকরংশ করুব ।” গতিক বড় ভাল নয় ! মুখরাজ, স'রে পড় । তোমার ঐ মা-ই ভাল, আর হৈ-চৈ ভাল ।—এখন শোও গে, যাও ।

২

“খোকা ! খোকা !”

আমি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি, বেলা হইয়া গিয়াছে—
রোজ উঠিয়াছে ? মা তাই ব্যস্ত হইয়া ডাকিতেছেন —

“খোকা ! খোকা !”

“কি মা !”

“ওঠ না, কত বেলা হয়েছে দেখ দেখি ! আর কত ঘুমুবি ?
এত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছিস্ যে ? অসুখ করেনি তো ?”

“অসুখ করতে যাবে কেন ?”

“তবে ওঠ শীগগীর । কখন চা খাবি ? ছ'বার গরম জল ঠাণ্ডা
হয়ে গেল ! কা'ল রাত্তিরে বুঝি ঘুম হয় নি ?”

আমি দেখিলাম, এইবারে মায়ের জেরা আরম্ভ হইল। এক একটি প্রশ্নে আমার মনের সব কথাগুলি একটি একটি করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইবে। আমি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম,—

“মা! তুমি আর রোজ রোজ অমন ক’রে পিঠে-পোলাও রেধো না।”

যাঃ—এই কথায় সবই তো বলিয়া ফেলা হইল!—বদহজম, মাথাগরম, অনিদ্রা, হাবড়হাটি ভাবনা।

মা বলিলেন,—“রাত্রে বুঝি ভাল ঘুম হয়নি তোঁর? কেবল এলোমেলো ভেবেছিঁসু?”

ইনি কেমন করিয়া যে আমার মনের সকল কথা জানিতে পারেন, আমি বুঝিতে পারি না। আচ্ছা, ঐ দাম্পত্য—সে ও কি এমন মনের কথা বুঝতে পারে? মার কাছে আমার কোনো কথা লুকুতে ভয় করে। মনে হয়, দুটো উজ্জল তাঁক্ সক্রম চক্ষু যেন আমার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতেছে। কোন কথা লুকাইয়াছি, দেখিয়াছি, মা কেবল হাসিয়াছে। অমনি অপ্রতিভ হইয়াছি। তার পর সত্য মনের ভাব বলিয়াছি।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিলাম, হাত মুখ ধুইয়া চা ও মোহন-ভোগ খাইতে খাইতে বলিলাম,—

“তুমি কেমন বাপের মেয়ে,—কেমন ঠিক্ ঠিক্ বল, বুঝব!”

মা হাসিয়া বলিলেন,—“কেন, কি হয়েছে?”

“আচ্ছা মা, ঠিক্ ক’রে বল দেখি, মায়ের ভালবাসা বেশী, কি বোয়ের ভালবাসা বেশী?”

কি দৃষ্টু মেয়ে! বলিলেন,—

“তুই বে কর না, তা হ'লেই বুঝতে পারবি।”

আমি আর কথাটি কহিলাম না, চুপ করিয়া গেলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, ক্লাবে এ কথা তুলিব, দেখি, আখার বন্ধু-বর্গই বা কি বলে। মোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলে সন্তুতর পাইব না। বৌ হয়ে ইস্তক ওটা সতি সতাই ব'য়ে গেছে।



সন্ধ্যার পর ক্লাবে গেলাম। তাই তো, ক্লাবের কথা তো এতক্ষণ বলাই হয় নি। এইখানে তবে একটু পরিচয় দি।

অনেক রিডিং ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব আছে। সব এক একটা উদ্দেশ্য লইয়া ক্লাব করে। আমাদের নিরুদ্দেশ্য ক্লাব, সুতরাং ইহার নামকরণ হইয়াছে—ক্লাবিং ক্লাব (clubbing club) ক্লাবিং কথাটার মানে লাঠা লাঠি। সে অর্থেও যদি কেহ গ্রহণ করেন, আপত্তি নাই। ডিস্কাসন্ (discussion), ডিবেট (debate) তো হয়ই, তার উপর— একটা কথা বলে না?— হাত থাকতে মুখোমুখি কেন? যে অর্থেই নিন, আমাদের club এর নাম ক্লাবিং ক্লাব। সাত বন্ধু একত্রিত হইবার জন্ম ক্লাব।

এক্ষণে বলা যাক, ক্লাবে কি কি আছে। উহাতে গীত বাণের সরঞ্জাম, ছোটখাটো ভোজের এবং সাহেবি ধরণে খেলার বন্দোবস্ত আছে, তা ছাড়া লাইব্রেরী আছে। কেবল একটা জিনিষ নাই, সেইটে হইলেই একটি ছোটখাটো বিলাতি ক্লাব হইত। তবে ভরসা আছে, একদিন তা হবে। যেমন নরের

সঙ্গে নারীর, তেমনি গীতের সঙ্গে নৃত্যের যোগ স্বাভাবিক। এই যোগ হইতে নৃত্যটি আমরা বিয়োগ করিয়া দিয়াছি।

ঘর এবং বাহির—বাঙ্গালায় দুইটা আলাহিদা চিহ্ন। পাঞ্জাবে মাত্র একটি সূক্ষ্ম পরদার ব্যবধান। বিদেশে ঘোমটা থাকে না, থাকিলে অচেনা পথ চলা মুশ্কিল। আমরা প্রবাসী, আমাদের ঘোমটা নাই।

ব্যবধান,—নম্রতার, মধুর সম্বিত লজ্জার, আর সসম্মম আশ্রমর্যাদার; ফুরফুরে শান্তিপূরের সূক্ষ্ম সূতোর বোনা, ফুরফুরে দারোয়ান নয়। ঘোমটার তলে খেমটা—ওটা বাঙ্গালার বাঙ্গালীর বোল, লাহোরের প্রবাসী বাঙ্গালীর নয়। এ কথাটা বলিয়া রাখা ভাল, এবং জানিয়া রাখা ভাল।

এই ক্লাবে ছয়টি ষড়রিপুর মতন আমার ছয়জন সঙ্গী নিয়ত বিরাজ করিতেন। ক্লাবে ঢুকিয়াই দেখি, ষড়রিপুর একটি বাদে পাঁচটি বন্ধুরিপুর বৈদ্যাতিক আলোর নীচে সমুপস্থিত।

দুই জন টেবিলের দুই দিকে দুইখানি চেয়ারে বসিয়া অতি মনোযোগ সহকারে যুদ্ধতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও যুদ্ধ করিতেছে। টেবিলের উপস্থিত দেশলাইয়ের বাক্স সিগার কেস, এবং সোডার গ্লাস সাহায্যে যুদ্ধ বর্ণনা করা হইতেছে। একজন বলিল, “খর দেশলাইর বাক্স জাম্বাণ, এই সিগার কেস ফরাসী, আর এই ভারডুন্” বলিয়া সোডার গ্লাস দেখাইয়া দিল। দিয়া বলিল, “এখন এই দেশলাইয়ের বাক্স সিগার কেসকে হটাইয়া দিয়া সোডার গ্লাস অধিকার করবে।”

কি আশ্চর্য্য! বন্ধু আমার এমন সমঝদার এবং যুদ্ধতত্ত্ববিদ হইয়াও একবার ভাবিতেছেন না যে, দেশলাইয়ের বাক্স সোডার গ্লাসে পড়িলে কি দশাটা হইবে। কিন্তু তিনি বলিয়াই যাউতে লাগিলেন.—

“এখন, সিগার-কেসকে হটাইতে না পারিলে দেশলাই কিছুতেই সোডার উপর গিয়ে পড়তে পারবে না।”

শুনিয়াই শ্রোতা বলিয়া উঠিল.—

“কেন? সোডার গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে এলেই হ'ল।”

যুদ্ধবিদ হুঙ্কার করিয়া বলিল,—“মূর্খ! এ কি সত্য সোডার গ্লাস? ওটা একটা পাহাড়, তার উপর দুর্গ।”

“বটে বটে!”

বলিয়া শ্রোতা সব বুঝিয়া ফেলিল।

ওদিকে দুইজন ফরাসে বসিয়া। গভীর চিন্তা করিতে করিতে একজন চোঁচাইয়া উঠিল,—“এই কিস্তি।”

বলিয়াই সোৎসাহে ফরুসির নলের পরিবর্তে একখানা হাতপাখার বাঁট মুখে গুঁজিয়া ফরুসি টানিতে লাগিল। দ্বিতীয় সতরঞ্চ ভায়া তখন আরও মসৃণলু,—“এই স্বস্তি।” বলিয়াই

পাশ্চস্থ ডিবা হইতে পানের পরিবর্তে একটি বোড়ে তুলিয়া লইয়া গালে পূরিল।

ওদিকে আর একজন এক কোণে বসিয়া এসূরাজে ছাড়ি টানিতেছেন—ক্যা কোঁ, ক্যা কেঁ;—বউ আমারে ক্যা কোঁ—স্বতো কেটে ক্যা কিনে দেছে ক্যা—কোঁ—ক্যা—কোঁ, ক্যা—কোঁ—তার পর অনেক কষ্টে বাহির হইল “বাজ্‌না”, তৎক্ষণাৎ

এসূরাজ ভায়া মহা উল্লাসে বেহদ বেমুরা গলায় যোগ দিল—
‘উঁহ, বল আমারে হতো কেটে, কিনে দেছে ক্যা কোঁ’—ঘন
ঘন মাথা চালিতে চালিতে—‘কিনে দেছে ক্যা কোঁ—কিনে
দেছে ক্যা কোঁ—বউ আমারে—ক্যা—কোঁ’—

হুতোর বউ ! বউ এখানেও এসে জুটেছে !—দাঁড়াও !

যুদ্ধের টেবিলে গিয়া ‘ভারডুন্ দখল’ বলিয়া গ্লাস শুদ্ধ সোডা
এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ ফরাসে গিয়া
সতরঞ্চের ছক্ উণ্টাইয়া দিলাম। দিবামাত্র দুই বন্ধু একেবারে
চীৎকার করিয়া উঠিল। যিনি পাথার বাঁট টানিতেছিলেন,
তিনি ঘন ঘন টানিতে লাগিলেন। যিনি পানের বোড়ে
চিবাইতেছিলেন, তিনি মহসা ‘খু খু’ করিয়া মুখের বোড়েটা
ফেলিয়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন। তার পর এসূরাজ ভায়ায়
কাছে গিয়া তাহার কান ধরিয়া শ্রুত্রে সঘন অঙ্গুলি সঞ্চালন
কারিতে করিতে আমিও গাহিতে লাগিলাম, ‘বউ আমারে দাড়ি
ছেঁটে—ক্যা কোঁ, ক্যা কোঁ’—

এসূরাজ হাসিয়া উঠিল।

আমার ষড়রিপুর একটি রিপু অনুপস্থিত। যদিও ইহার
অনুপস্থিতিতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না, তবুও ইনি আসিয়া
একখানি সোফার শয়ন করিয়া কেবল কবিতা পড়েন—বেশীর
ভাগ Shakespear—এবং জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখেন।
আমাদের এত তর্ক বিতর্ক হয়, তিনি সে সকলে যোগ তো দেনই
না, বরং চোঁচামিচির মাত্রা একটু বেশী উঠিলে দুই কান বন্ধ
করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পড়িতে থাকেন। তবু, নিত্য নিয়মিতরূপে

থাকে একবার দেখা যায়, তাকে না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“ব্যারিষ্টার কোথা ?”

আমার এই সেক্সপিয়ার বকুটি একটি ব্যারিষ্টার। পাঞ্জাব লোয়ার কোর্টে প্রাক্টিস করেন আর ভেরেণ্ডা ভাজেন। মক্কেল ইহার আক্কেলের মতো একেবারে অশরীরী।

তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—
“ব্যারিষ্টারকে দেখ্ ছি না কেন ?”

আমার প্রশ্নে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। তাহা দেখি যা আমারও মনে একটু আশঙ্কার সঞ্চার হইল, বুঝি কোনো অশুভ সংবাদ আছে। একটু উৎসাহেই জিজ্ঞাসা করিলাম—

“কি, জবাব দিচ্ছ না কেন ? তার কিছু অসুখ করেছে না কি ?”

এসরাজ ভায়া বলিল,—“না, সে বড় ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে !”

আমি আরও উতলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কি রকম, কি রকম ? ফ্যাসাদ কি ?”

আবার তেমনি মুখ চাওয়া-চাওয়ি। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—“তোমাদের ভাব বুঝতে পাচ্ছি না। সে তো নিরীহ লোক, কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে ?”

তখন ১নং সতরঞ্চ বলিল,—“সে প্রেমে পড়িয়াছে !”

শুনিয়া আমি যারপরনাই বিস্মিত হইলাম, বলিলাম,—

“বল কি ! প্রেমে পড়েছে ! কোথায় ? কি কচ্ছে এখন ?”

যুদ্ধবিদ্ বলিল,—“কবুবে আর কি ! খালি বিড়-বিড় কচ্ছে, আর মাঝে মাঝে সাপের মতন ফোঁস্ ফোঁস্ কচ্ছে।”

আমি মুখে কেবল ‘ঠিক হইয়াছে!’ বলিয়াই তিলেক বিলম্ব না করিয়া সটাং ব্যারিষ্টার বন্ধুর বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই দেখি, বন্ধুর বসিবার ঘরের দরজা বন্ধ। ঠক্-ঠক্ করিয়া দুই তিনবার শব্দ করিলাম। ‘ব্যারিষ্টার, ব্যারিষ্টার’ বলিয়া হাঁকিলাম, কিন্তু কোনই সাড়া শব্দ পাইলাম না। শেষে জোর করিয়া দরজা ধাক্কা মারিয়া খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, বন্ধু অর্ধশায়িত অবস্থায় একখানি সোফার উপর পড়িয়া আছেন। সেই সোফাতে, মেজেতে এবং সামনের টেবিলের উপর বই, ছেঁড়া কাগজ, এবং চুরুটের ছাই ছড়ানো। আমি এই সব দেখিলাম, কিন্তু বন্ধু আমার দেখিলেন না। তান যেমন চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিলেন, তেমনই রহিলেন। সোফার উপরের একখণ্ড ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা রয়েছে—

“সহসা হৃদয় মাঝারে আমার

প্রেমচন্দ্র উদয় হলো।

দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে—”

এই পর্য্যন্ত। আমি টোবল হইতে কলমটা তাড়াতাড়ি কালিতে ডুবাইয়া শেষ লাইনটা সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম।—

“দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে

কাসিতে কাসিতে বেঘোরে য’লো।”

লিখিয়াই একটা বিদ্যুটে হাসি পাইল। কবিতার চরণ মিলাইতে পারি, এত বাহাদুর আমি! :এ কথা তো আমি পূর্বে জানিতাম না। পীরিত দেখছি, বিষম ছোঁয়াচে রোগ! ব্যারিষ্টার

তাহার সংস্পর্শে আসিয়াই কবি হইয়াছেন আর আমি সংস্পর্শের সংস্পর্শে আসিতে না আসিতেই কবি হইয়া উঠিলাম ! আমার হাসিতে বন্ধুর চমক হইল। তিনি অতি কাতর-চক্ষে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—

“ওঃ মুখরাজ !”

“হাঁ—এতক্ষণ চিন্তে পারান নাকি ?”

“আর ভাই, আমার দফা রফা !”

বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্যারিষ্টার তাহার টুপিটা হাত ড়াইয়া মুখের উপর ঢাকা দিল। সে টপ্ হ্যাট (Top hat) ঢাকা মুখের শোভা, যিনি ‘রামলীলা’ কখনো দেখেন নাই, তিনি কল্পনাও করিতে পারিবেন না। আমি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। বন্ধু ধিয়েটারী ডোলে সে হ্যাটের ভিতর হইতে হাঁড়িটাচার গলায় বলিয়া উঠিল,—

He jests at scars that never felt a wound.”

বলিয়াই বাংলায় অনুবাদ করিলেন—

‘ঘা নাই যার দেহ পরে,

অস্ত্ৰচিহ্ন ঠাট্টা করে।

ঘুঁটের পোড়নে হাসে গোবর যেমন

বক্ষ্যা কি জানিবে বল প্রসববেদন !’

শুধু অনুবাদ নয়, অনুবাদের উপর শেষ দুই লাইন ফাউ !

আমি বলিলাম—একটু গন্তীরভাবেই বলিলাম,—

“সে তো হ’লো। এখন ব্যাপার কি বল দেখি ?”

“ব্যাপার ?” বন্ধু বলিলেন, “ব্যাপার !—Grievous hurt

amounting to homicide !—সাংঘাতিক আঘাত !—মাথায়
নয়, পিঠে নয়, পেটে নয়, বুকে নয়, মুখে নয়, হৃৎপিণ্ডের উপর !”

বলিয়া বন্ধু আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া
কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিল,—

“ভাই রে ! আমি মরেছি, মরেছি ! তার রূপের অন্ধকূপে
প’ড়ে আমি মরেছি ! এখন আমায় বাঁচাও !” বলিয়াই আবার
ফোঁস করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, আর বিড়-বিড় করিয়া বলিতে
লাগিল,—

Oh Romes Romes, wherefore

art thou Romes !

Deny thy father and refuse thy name,

And I’ll no longer be a barrister !—

এখানে Romes অর্থে মিস্ গ্যান্ডলী ! হায় !
হায় ! Love’s Labours Lost !—অর্থাৎ প্রেমের প্রসব-
বেদনার একেবারে অন্তিমকাল উপস্থিত ! বন্ধু, আমায়
বাঁচাও !”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“এতো আবোল-ভাবোল বকুছ
কেন ? কা’ল রাত্রে ঘুমোওনি নাকি ?”

বন্ধু হতাশ চক্ষে চহিয়া বলিল,—“ঘুম !

Macbeth doth murther sleep

Macbeth shall sleep no more ।

Macbeth মানে কি বোঝো ?”

আমি বলিলাম,

“Macbeth Shakespeareএর একখানা নাটক আর কি ।
এই বুঝি ।”

বন্ধু বলিল, “ছাই বোঝো ! এখানে Macbeth অর্থে প্রেম !”
আমি বলিলাম,—“তা তো হলো । এখন কথাটা কি বল
দেখি ?”

বন্ধু বলিল,—“কথা ? To be or not to be, that’s the
কথা । ওঃ—ওঃ—So sweet was ne’er so fatal ! প্রেমের
সন্দেশ যে এত কটু তা আগে কে জানতো বল ?”

আমি বলিলাম,—“যাক, এখন বাজে কথা ছাড় ।”

“বাজে কথা ! Oh, hard-hearted ! আরে শক্তহৃদয় !”

সত্যই আমার রাগ হইল । বলিলাম, “তবে আমি চল্লুম !”

সে এমন হতাশ-কাতর নয়নে আমার মুখের পানে চাহিল
যে, আমি আবার বসিয়া পড়িলাম । জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“কথাটা কি ভেঙ্গেই বল না ? যদি কোনো উপায় থাকে
তো করবো : শুধু Shakespeare ঝাড়লে কি হবে ?”

বন্ধু চটিয়া উঠিয়া বলিল,—“Shakespeare ঝাড়বো না ত
কি ঝাড়বো ? ব্যারিষ্টার গ্যাঙ্গুলীর নাম শুনেছ তো ?”

আমি বলিলাম,—“অবশ্য । কে না শুনেছে ?”

“আচ্ছা, গ্যাঙ্গুলীর একটি কণা আছে তা শুনেছ ?”

“হাঁ, তা ও শুনেছি । তেমন অপরূপ রূপ শুনেছি পাঞ্জাবে
নাই !”

“তাকে কখনো চোখে দেখেছ ?”

“না ।”

“তাহ’লে আমার কথা সব বুঝতেও পারবে না।”

আমি বলিলাম,—“বল না গুছিয়ে। পারবে না কেন? অমন অধীর হ’লে চলবে কেন? যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুলও তো আছে।”

ব্যারিষ্টার সবলে আমার হাত দুটা চাপিয়া ধরিয়া কাতর-নয়নে আবার আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি বলিলাম,—“বন্ধু তুমি আশস্ত হও। যদি তোমার এ বিকারের কোনরূপ প্রতিকার থাকে—”

সে উঠিয়াই আমাকে জোর করিয়া টানিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। ঘন ঘন সেক্‌ছাও করিয়া বলিল,

“Canst thou not minister to a mind diseased?”

আমি চটিয়া বলিলাম,—“দেখ, তুমি ওরকম করলে আমি কিছুই করতে পারব না।”

সে বলিল,—“কর্বে?”

আমি বলিলাম,—“তুমি কি তার সন্দেহ কর? তুমি যদি জলে ডুবতে চাও, আমি দড়ি-কলসী যোগাড় ক’রে দেব না? এ কি কথা? এখন বল, কোথায় সে রূপসীকে দেখলে।”

“পার্কে একদিন সন্ধ্যার পর খুব চাঁদ উঠিয়াছে, আর মিঠে মিঠে বাতাস বইছে। সুন্দরী বাপের হাত ধ’রে পায়চারি ক’রে বেড়াচ্ছিল। তার পরদিন সকালবেলা আমি অম্মি মিঃ গ্যাঙ্গুলীকে সম্মান প্রদান করতে গেলুম।

“কেন? গ্যাঙ্গুলীকে কি এতদিন কোটে সম্মান প্রদান কার হয় নি?”

“আরে, তুমি ত ভারি বোকা ! তিনি practice করেন— High Courtএ, আমি করি, Lower Courtএ—দেখা শুনা হয়নি তো ! আর হবেও না। যা হোক, গ্যাঙ্গুলী তখন বাড়ী ছিলেন না। এই সুন্দরী—এই অপরী—এই কিন্নরী—এই হরী এই পরী—যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন ! বন্ধু. তুমি স্বর্গের বাজনা কখনো শুনেছ ?

আমি বলিলাম,—“ না। শপথ করিয়া বলিতে পারি না। সে কি রকম ?”

“সে ঐ সুন্দরীর স্বর যে রকম। সুন্দরী আমার দিকে চেয়ে কপাল কুঁচকে একটু বিরক্তভাবে বলিল,—

“আপনি কা’কে খোঁজেন ?”

“বাস্ এই হ’য়ে গেল আর কি ! আমি বলিলাম—আমি মিঃ গ্যাঙ্গুলীকে সম্মান দেখাতে এসেছি।”

তিনি বলিলেন,—“আজ তাঁর দেখা পাবেন না, কাল আসবেন।”

“কি করি, আর অপেক্ষা করতে পার্‌লুম না চলে এলুম। কিন্তু চ’লে আসতে আসতে একবার ফিরে দেখলুম যে, আমার অভিসার ব্যর্থ হয় নি, সুন্দরী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার লক্ষ্য করছেন। এমনি ক’রে, যাওয়া আসা শুরু হ’ল। কিন্তু গ্যাঙ্গুলীর সঙ্গে আর দেখা করলুম না। শুনলুম সে বড় খাম-খেয়ালী লোক, হয় ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে দেবে না। ক্রমে, লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে আসতে বুঝলুম, মিস্ গ্যাঙ্গুলী কবিতা ভালবাসেন, ফুল ভালবাসেন, আর তার আনুসঙ্গিক

যত কিছু আছে—অর্থাৎ আকাশ, বাতাস, জ্যোৎস্না, টাঁদের আলো, সবই ভালবাসেন। ভায়া এককাল ধরে আইন পড়লুম, লাহোরে অলিগলি মক্কেল খুঁজে খুঁজে মরলুম, কিন্তু মিস্ গ্যাঙ্গুলীর হৃদয়ের ভেতর চোকবার পথ যে কোন্ দিক দিয়ে তা টের পেলুম না। একদিন হঠাৎ সে দরজা খুলে গেল!—”

এদের কোর্টশিপের গল্পটাও বেশ জমে আসছে, আমারও শুনিবার কৌতুহল ক্রমে বাড়িতে লাগিল। আমি খুব আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“তার পর, তার পর?”

ব্যারিষ্টার বলিল,—“আমি আনাগোনা করতুম, বুড়ো গ্যাঙ্গুলী যখন বাড়ী থাকত না অর্থাৎ কোর্টে বেরতো। অমনি রোজু বাই আর চপলার সঙ্গে প্রেমালাপ করি। মিস্ গ্যাঙ্গুলী থাকেন, আর তাঁকে মানুষ করেছিল এক বুড়ী দাই, সেই থাকে তাঁর পাহারা। একদিন গিয়ে দেখি, মিস্ গ্যাঙ্গুলী গান কচ্ছেন, আমি আস্তে আস্তে গিয়ে ঘরের কোনে প্রকাণ্ড হারমোনিয়মটায় বসে গেলুম আর, তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে লাগলুম। তিনি বিস্তার হইয়া গাইছিলেন, আমার বাজনার সঙ্গে তাঁর গাইবার উৎসাহ শতগুণে বেড়ে গেল। এইতেই বুঝতে পারছি, আরো কি বলতে হবে?”

আমি বলিলাম,—“হবে বৈকি? আমি ও সব ভাল বুঝিনে।”

“তবে কি ছাই বোঝো! শোনো, তিনি গান, আমি তাঁর মুখপানে চেয়ে বাজাই, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি! তার পর, একদিন হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—‘আপনি কোটেই যান না কেন?’

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করলুম,—‘কোট বড় না কোটশিপ্
বড়?’

“দেখলুম, মিস্ গ্যাঙ্গুলী যে অত গোলাপ ভালবাসে, তার
মান্নে আছে। আমি তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা প্রত্যক্ষ
করলুম। বুঝলুম যে, আমার ঔদ্ধত্য তাঁর অপ্রিয় হয়নি,
কালকে একবার শাকের ক্ষেত দেখালে, তাকে সামলানো
দায়!—জান তো? তোমরা জানতে, আমি ভালমানুষটির
মতো নিত্য আদালতে যাচ্ছি; এখন বুঝছো, কোথায় যেতুম।

ক্রমে একদিন বিবাহের কথা তুললুম। চপলা চকিত
হয়ে, ঘাড় হেঁড়্ ক’রে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন—

“হায়রে বসন্তে যথা—

শ্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম কাননে!”

এখানে “কুসুম-কানন” মানে ডি, পি, চট্টরাজ—
(D. P. Chattaraj)—হায়রে প্রবল ঝড়ে যেমন চালের
মটকা উড়ে যায়, সেই দীর্ঘশ্বাসে তেমনি ডি, পি, চট্টরাজের
আশা বাড়ী একেবারে ভূমিসাৎ!”

বলিয়া সে একেবারে এমন ক’রে ঠোঁট্ হুট্ চেপে বসলো
যে আমার মনে হ’ল, আর জীবনে সে মুখ খুলবে না!

আমি সহানুভূতিসূচক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা
করলুম—“তারপর? আশা বাড়ী তো ভূমিসাৎ!”

“তারপর আমিও কূপকাৎ! বন্ধু, ডি, পি, চট্টরাজকে
আর তোমরা দ্বিজপদ চট্টরাজ ব’লে ডেক না। ডি, পি, এখন
দ্বিজপদ নয় ডিসাপয়েন্টেড্ (Disappointed) কিংবা

ডেস্পেরারিং (Despairing) । চট্টরাজ অর্থে লাভার (Lover) অর্থাৎ Disappointed or Despairing lover—
কি না 'হতাশ-প্রেমিক' ।”

আমি বলিলাম,—“ভাল, হতাশ প্রেমিক ! তুমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ছ কেন ?”

সে বলিল,—“ভাইরে, বন্ধুরে, প্রাণের তারিণী শঙ্কর রে, আমার প্রাণের প্রাণ “মুখরাজ” রে, সরলা বালা যখন বিবাহের কথায় একেবারে বিরহের লক্ষণ প্রকাশ করে ফেলে, তখন জানুবে ভিতরে একটা গোলযোগ আছেই আছে ।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে সে সৌভাগ্যবান, যার জন্ত আমার প্রত্যাখ্যান করছ ?” এখানে সৌভাগ্যবান অর্থে হতাশাগা । তার মুখ আবার লাল হয়ে উঠল । বললে, ‘আমি আর কাউকে ভালবাসিনি । ‘আর’ এই ছোট্ট ‘আর’ কথার যে এত মানে হ’তে পারে তা কোন অভিধানে পাবে না । এখানে ‘আর’ মানে ডি, পি, চট্টরাজ কিন্তু এবার Disappointed নয় দার্পিত চট্টরাজ অর্থাৎ চট্টরাজ ছাড়া আর কাউকে ভাল বাসিনি । ভাবলুম আমাকে ভালবাসে অথচ বিবাহের বেলা চূপ ! অবশ্য তার মানে আছে, কিন্তু কুমারী চপলা তা বুঝিয়ে বলতে অক্ষম । আমি সেই বুড়া দাইএর স্বরণাপন্ন হলাম । তাকে বললুম, “দাই মা !”

মাতৃ সম্বোধনে সে গ’লে গেল, অমনি তৎক্ষণাৎ দশ টাকা প্রণামী পায়ে নয়, তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “চপলার বিবাহের কি হচ্ছে ?”

সে বললে, “এই লাহোরে কে একজন দ্বারিক প্রসাদ চট্টরাজ আছে তার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক হচ্ছে।”

সেখানে যদি একখানা চেয়ার না থাকত, আমি বুর্ছা যেতুম। দাই আমার অবস্থা ঠিক বুঝলে না, বলে যেতে লাগল—“সেই দ্বারিক প্রসাদের অনেক টাকা কি না? চপলার বাপ মিন্‌সে এত রোজগার করে, তবু টাকার খাঁই মেটে না। হুঁহাতে খরচ করে কি না? এক দিক্‌দে চোকে, এক দিক্‌দে বেরোয়। নিজে তো কিছু রেখে যেতে পারবে না, তাই ঠাট্টা করেছে—ওই টাকার কাঁড়ির সঙ্গে চপলার বে দেবে। নাতি-নাত্নি হবে সিকি-হু আনৌ! মেয়ের একটা হিল্লি ক’রে যাবে। সে ছোঁড়া আবার চপলাকে কোথায় দেখেছিল জানিনি সে একেবারে ঝুঁকে পড়েছে। তাকে লোক পাঠিয়ে ছিল। চপলার বাপ বলেছে, “যদি সে আমার মেয়েকে তার সব টাকা বিষয় সম্পত্তি লিখে পড়ে দেয়, আর আমার বাড়ীতে এসে ঘরজামাই হয়ে থাকে, তবে তাকে নিজেকে আমার চিঠি লিখতে বোলো। তাকে দেখে তার সঙ্গে কথা ক’রে যদি আমার মেয়ের পছন্দ হয়, তো তাকে মেয়ে দেব।” মিন্‌সের এমনি টাকার ঝোঁক। সে পাস্তোর কেমন, একবার চোখে দেখলে না! তার খুব টাকা আছে শুনেই নেচে উঠেছে।”

দ্বারিকাকে যে আমি চিনি, সে কথা বলিলাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, “তার চিঠি এসেছে? সে ঘরজামাই থাকতে রাজি?”

দাই বললে, “ঐ খানেই গোল বেধেছে। সে-ও মায়ের এক ছেলে, ধর জামাই থাকবার জন্তু মা’কে রাজি করতে পারছে না। তা বাবা, সে মা’র আত্মরে ছেলে, মা কি তার আবদার না শুনে পারে? হয় ত মাগী শুদ্ধ এসে ছেলের সঙ্গে বেই বাড়ীতে বাস করবে।”

ভায়া, সেদিন যে চপলাকে “গুড্‌বাই ক’রে চলে এসেছি, আর সেখানে যাইনি। এক একবার রাগ হয়, দ্বারিক-ব্যাটার নামে Criminal misappropriation এর চার্জ আনি।”

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম,—“Criminal misappropriation !”

বন্ধু বলিল, “নয়? সেই কলে কিষ্টে দ্বারকে বেটা চপলাকে আত্মসাৎ করবে? আর বুড়ো ব্যাটা তাতে Aiding and abetting? শুধু criminal misappropriation!—টাকার লোভ দেখিয়ে চপলাকে ‘co-ercion’ করছে। তার পর ধর, এতে আমি ক্ষেপে যেতে পারি, খুনোখুনি করতে পারি, কাঁ ক’রে একটা ব্রিচ্ অবদি পাবলিক্ পিস্ (Breach of the public peace) হ’তে পারে! whoever commits an act likely to endanger public safety.—”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—“আরে থাম, থাম!”

“থাম্ব! আচ্ছা, তোমার কথায় থামলুম, কিন্তু A horse ! A horse ! My Kingdom for a horse !—এখানে horse অর্থে চপলা গ্যাঙ্গুলী। মিস্ চপলা গ্যাঙ্গুলী কবিতা ভাল বাসেন, তাই কবিতা লেখা অভ্যাস করেছি।”

তুমি যদি আমার ‘পোড়া সন্তে’, ‘চামচিকের বিলাপ’, ‘কাকের অবৈধ জনতা,’ ‘ছিন্ন পুঁটুলি’, ‘ধোলাখকুচির প্রেমালাপ’, ‘ছোড়া চুল,’ ‘দড়ির হা হতাশ’—এ সব কবিতা যদি শুনে তাহ’লে বুঝতে, স্পর্শমণি সত্যই লোহাকে সোনা করে !”

আমি বললাম,—“ ভায়া, আমি না শুনেই বুঝেছি, বিশেষতঃ ঐ ‘দড়ির হা হতাশ’টা। সেটা নিশ্চয়ই খুব চমৎকার হ’য়েছিল, কেননা প্রেমে গলা বেঙেন করতে না পেরে তার যে কি আক্ষেপ !—”

বন্ধু চটিয়া বলিলেন,—“দেখ, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না !”

আমি বললাম—“না সে কথা ঠিক !—এখন কি চাও, বল ।”

ব্যারিষ্টার উত্তেজিত হইয়া বলিল, “চাই ! চাই ধন্য হতে,— চাই মানব জীবন সার্থক করতে—চাই সেই সিনিয়রের (Senior) মুণ্ডপাত করতে আর তার কণ্ঠকে আমার ব্রাহ্মণী করতে ।”

“চাও তো, কিস্তি কেমন ক’রে ?”

“সে তুমি বোঝো। খুব লম্বা কথা কইলে, কি চাও ?
আমি তোমায় বল্লুম, যা চাই ।”

“আচ্ছা ভায়া, এ স্বারিক্ চট্টরাজকে তুমি চেন ?”

“সে ব্যাটাকে চিনিনি ? সে আমাদের জ্ঞাতি । তার ঠাকুরদা এখানে এসে ব্যবসায় অনেক টাকা রোজগার করে । তাদের ধরেই আমার বাপ এখানে এসেছিলেন । ব্যাটা বদখৎ, বেয়াড়া বুনো ব্যার ! ধারে না লেখা পড়ার ধার । ব্যাটা বাদরের গলায় মুক্তোর হার ! আর আমার কপালে খার ! ভায়া,

একে যদি করতে পার পগার পার, তাহলে আমাকেও বাঁচাও, চপলাকেও বাঁচাও। একেবারে এক টিলে দুই পক্ষী মরবে।”

সত্য! মা বলেন, এমন রোগ নেই যার ওষুধ নেই। দেখা যাক না কত দূর কি হয়! বন্ধুকে বলিলাম, “ভায়া ঘাবড়োনা।”

বন্ধু বলিল, “কেন ঘাবড়াব না। ঘাবড়ালে সে বুড়ো ব্যাটা কি করবে?”

আমি বলিলাম,—শোনো, আগে আমি একবার সহর জমিন তদন্ত ক’রে দেখি। যদি কিছু করতে পারি। না পারি, তখন ঘাবড়ো।”

ব্যারিষ্টার দাঁড়াইয়া উঠিল। সোৎসুখ নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল,—

“Arm! Arm! it is—it is—the cannon’s opening roar! অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর, প্রেমের গর্জন! এখানে cannon মানে কামান নয়—প্রেম। যাও বীর, অক্ষয় বশ উপার্জন ক’রে এস। বিজয়-লক্ষ্মীর জয়মাল্য মাথায় জড়িয়ে এস, আর মাঝে মাঝে আমার মিস্ চপলার খবরটা দিয়ে যেনো।”

আমি বিদায় হইলাম।

৪

খবর নিলুম, গাঙ্গুলী একজন লোক চায়, তার ফায়-ফরমাস্ খাটবে। কিন্তু বোকা-সোকা লোক হবে। উনি যা বলবেন, বাচবিচার না ক’রে তাই করবে। তার ডান বাঁ জ্ঞান থাকবে না। দেখবে তাঁর চোখে, শুনবে তাঁর কানে,

আর ওগ্ৰাবে তাঁর কথা—হজম না করে। কোন চতুর লোক একবার কি তাঁর অনিষ্ট করেছিল, সেই থেকে হুঁসিয়ার হয়েছেন।

এই ত সুযোগ! শত্রুর কেল্লায় প্রবেশ করতে হবে—
all is fair in love and war. “ব্যারিষ্টার বন্ধু হয় ত এর
অনুবাদ কর্ত, “প্রেমে কি আহবে হয় সকলই সুন্দর।” একটা
মৎলব এঁটে বললুম,—“মা!”

“কি?”

“আমাদের ব্যারিষ্টারের গতিক বড় ভাল নয়!”

মা আমার মুর্তিমতী জগদ্ধাত্রী। এমন হতভাগ্য কেহ
নাই, যার জন্ম তাঁর চক্ষে করুণার অশ্রুর উদয় হয় না। মুখে
দরদের ‘আহা!’ নির্গত হয় না; আমি এ ছোটখাট
মানুষটির হৃদয়ের অন্ত পেলুম না। এ হৃদয়ের করুণাধারা যে
দৃষ্টিরূপে পান করেছে, সে সত্যই ভাগ্যবান। আমার মা
আমার নরজন্মের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য ব’লে মনে করি।
ব্যারিষ্টারের কথা শুনিয়াই মা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—
“কেন রে, কেন রে!—কি হয়েছে।”

“সে পাগল হবার যোগাড় হয়েছে।”

“কেন! কেন?”

“বের জন্মে!”

“ওমা! তাই বল, তা বে করুক না, বেশ তো। তোর
মতন সবাই নাগা সন্নাসী হ’য়ে থাকবে নাকি? আপনি বে
করবি না, পাঁচজন বন্ধুবান্ধব—তাদেরও বে করতে দিবিনি!”

“দেব না কেন, মা? আমি যে তার ঘটকালি করতে যাচ্ছি।”

“হাঁরে খোকা! এত লোকের বের ঘটকালি করে বেড়াচ্ছিস, আমার একজনের বে দিয়ে দেনা?”

“কেন দেবনা, মা!”

“দিবি বল?”

“হাঁ দেব—নিশ্চয় দেব। যদি ভাল পাত্তোর হয়, বের ভাবনা কি?—কার মা?”

“এই তোর কথাই বল্ছিলুম। দেখিস্ বাছা, আমায় কথা দিয়েছিস্!”

আমার পাঠক-পাঠিকাকে আমি একটি কথা বলিয়া রাখি, মায়ের কথা মনে হ'লে আমার কথা ফুরোয় না। আমার এই দুর্বলতাটুকু ক্ষমা করিতে হইবে। আমি মাকে বলিলাম,—

“মা, আমি তোমায় বলেছি, ভাল পাত্তোর হ'লে বে দিয়ে দেব! ষাক্ সে কথা, এখন শোনো, ব্যারিষ্টার যে মেয়েটিকে বে করতে চায়, তার বাপকে কোন রকমে রাজি করতে হবে। লোকটা এক রকমের! আমায় তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। রাজি করবার জন্তে সময়মত কথা পাড়তে হবে। কিছু দিন যদি সময়মত আমি আসতে যেতে না পারি, তুমি ভেবো না। মনে করো না, তোমার খোকা কচি খোকা; গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়েছে।”

মাকে সন্তত করিয়া আমি বাহির হইলাম, গরীব লোকের মত বেশ করিয়া। মার চরণ স্মরণ করিয়া মিঃ গ্যাঙ্গুলীর বাড়ী

গিয়া উঠিলাম। গ্যান্ডুলোর বাংলোর সামনে ফুল-বাগানে দুই-
খানি চৌকিতে পিতা ও দুহিতা বসিয়া আছেন। তখন বেলা
প্রায় অপরাহ্ন। আমি সেলাম করিয়া দাঁড়াইলাম। গ্যান্ডুলী
জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কে তুমি?”

“হুজুর! আপনি একজন লোক খুঁজিতেছিলেন—”

“ওঃ—তুমি সেই কাজ চাও? পূর্বে কোথায় চাকরী
করতে?”

“হুজুর! চাকরী কোথাও করিনি?”

“ওঃ—চাকরী কোথাও করিনি? তবে এখন কেন চাকরী
করতে এসেছ?”

“তাই তো হুজুর! কেন এসেছি, তা তো বলতে পারিনি।
চাকরী করতে ইচ্ছা হয়েছে, সমস্ত দিন ব’সে ব’সে ভাল লাগে না।”

“হঁ—বল, থামলে কেন?”

“আজ্ঞে, আর কি বলব—”

চপলা এতক্ষণ গোলাপ-কলি এবং ফার্ন লইয়া বাটন হোল
(Button hole) তৈরি করিতেছিল। ব্লাক প্রিন্স (Black
prince) গোলাপের কুঁড়ি মেইডেন হেয়ার (Maiden hair)
ফার্ন অতি নিপুণ হস্তে সোনালি সিল্কের সূতোয় বাঁধিতেছিল।
খানিকটা সূতা বড় হইল। নিজের টানাটানি করিয়া ছিন্ন করিতে
পারিল না। হঠাৎ আমার হাতে সেই তোড়াটি দিয়া বলিল,—
“এইটে ছিঁড়ে দাও দিকি?”

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে লইয়া অম্লান-বদনে
মূল ফার্ন টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া তাঁহারই হাতে ফিরাইয়া

দিতে যাইতেছি, তিনি একটা 'উঃ' বলিয়া হাত গুটাইয়া লইলেন এং স্তম্ভিত-বিস্মিত ভাবে বড় বড় দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ গ্যাঙ্গুলী হো হো করিয়া হাসিয়া হাততালি দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাভো ! ব্রাভো !"

বুঝলাম, আমার জয় হইয়াছে। গ্যাঙ্গুলী বলিলেন,—“আজ থেকে—এই মুহূর্ত থেকে, আমি তোমায় কাজে নিযুক্ত করলুম।”

মিস্ চপলা পিতার কথা শুনিয়া বিস্মিতনেত্রে তাঁহার মুখের পানে একবার চাহিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। গ্যাঙ্গুলী বলিলেন, “কেমন, তুমি পারবে তো ?”

“আজ্ঞে এই ফুলের তোড়া ছিঁড়তে, হজুর ? তা পারবো বই কি।”

গ্যাঙ্গুলী এবারও উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—

“না, শুধু তাই নয়। আরও দুই একটা কাজ আছে। যেমন যেমন ব'লে দেব, তেমনি করতে পারবে তো ?”

“আজ্ঞে, মনে হয় তো পারব।”

“কিন্তু এক সত্ত্ব। এখানকার কথা কারো কাছে কোথাও গল্প করতে পারবে না। এই জগেই আমি পাঞ্জাবী লোক রাখছি, নইলে বাঙ্গালা থেকে বাঙ্গালী ঢের আনিয়া নিতে পারতুম। বাঙ্গালীগুলো বড় ফাল্তো বকে।”

“আজ্ঞে, কোন্‌খানে কাজ করি, তাও কি বলতে পারব না ?”

“না।”

“তবে কি বলবে ?”

গ্যাঙ্গুলী বলিলেন,—

“আচ্ছা, সে আমি পরে বলবে দেব, কি বলবে।”

“যে আজ্ঞে, হুজুর ! কিন্তু আমারও এক সৰ্ত্ত আছে । আমি বাড়াতে গিয়ে খাব আর রাতে আপনার এখানে থাকব না !”

মিঃ গ্যাঙ্গুলীর একটা স্বভাব ছিল, মনের মধ্যে যখন কোনো কথা লইয়া তোলাপাড়া করিতেন, তাহা বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে করিতেন । বোধ করি, কোর্টে বক্তৃতা করিয়া করিয়া তাহা এই স্বভাবে পরিণত হইয়াছে । নিজেকে নিজে বক্তৃতা করিয়া কথা বলেন । আমি আমার সৰ্ত্তের প্রস্তাব করিলে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন অর্থাৎ বিড়-বিড় করিতে লাগিলেন ।

“তাই তো, লোকটা বোকার যাসু । হা—হা—কি মজা ! সূতোটা ছিড়তে বললে, তোড়াটা অনায়াসে সে কুচিকুচি ক’রে ফেললে । এমন মনের মতন লোক শীগগীর পাব না । এই তো এদিন খুঁজছি ।—ওহে ! তুমি রাত্তিরে থাকবে না বলছ, সন্ধ্যার পর যদি কোনো কাজ পড়ে ?”

“আজ্ঞে, কাজ ক’রে দিয়ে যাব, কিন্তু থাকতে পারব না ।”

“বেশ তাই । কি হ’লে তোমার চলে ?”

“আজ্ঞে তা তো বলতে পারিনে । সে আমার মা জানে ।— তা কি দিতে পারেন ? যা দেবেন, তাই ; আমার খালি এক মা ।”

“আচ্ছা বেশ, তোমার কাজ দেখে যদি সন্তুষ্ট হই, বেশ করে খুসী ক’রে দেব ।”

চাকরী স্থির করিয়া আমি বাড়া ফিরিলাম ।

৫

পরদিন মিঃ গ্যাঙ্কলী আমাকে চাকরীতে রীতিমত বাহাল করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমি আমার নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া রহিলাম।

মিস্ চপলা সহসা তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমাকে দেখিয়াই আবার ঢুকিয়া পড়িলেন। তার পর আবার একবার দ্বারদেশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলেন। আমি বুঝিলাম, ইনি আমাকে এক অদ্ভুত জানোয়ার ঠাওরাইয়া বসিয়াছেন, তাই নিকটে আসিতে ভয় পাইতেছেন। এমনি দুই তিনবার কক্ষ-মধ্য হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া অবশেষে সাহসে ভর করিয়া তিনি আমার দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিতেই আমি একটী সসম্মত সেলাম দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি আর কোথাও চাকরী করনি ?”

আমি বলিলাম,—“হুজুর, চাকরী-বাকরী আর কোথাও করিনি। তবে একজন ব্যারিষ্টার বাবু আমায় বড় ভালবাসেন, তাঁর কখনো কখনো ফায়টা ফরমাসটা খাটুতুম।”

মিস্ চপলা গালে হাত দিয়া বলিলেন,—“ও মা! এমন লোকও আছে, তোমায় ফায় ফরমাস খাটায়।”

“আজ্ঞে, সকল কুকুরেরই মুণ্ডর আছে!” উত্তরটাতে মিস্ চপলা বোধ হয়, একটু খুসী হইলেন। বলিলেন,—“বল তো, বল তো, সে ব্যারিষ্টার কে? তাঁর নাম জেনে রাখা দরকার। তোমার মতন লোককে দিয়ে যিনি কাজ আদায় ক’রে নিতে পারেন, তিনি হয় তোমারই মতন, নয় খুব বুদ্ধিমান।—কে ব্যারিষ্টার?”

“আজ্ঞে, তাঁর নাম চট্টরাজ সাহেব। কিন্তু লাহোরে তাঁকে অনেক লোকে নামটা সোজা ক’রে ‘চটি’ সাহেব ব’লে ডাকে।

চট্টরাজ সাহেবের নাম করিতেই যিস্ চপলার মুখখানি লাল টকটকে হইয়া উঠিল। তারপর ‘চটি সাহেব’ শুনিয়া তাঁর হাসি আর থামায় কে? অবশেষে সংযত হইয়া কিছু দূরে একখানা চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“আচ্ছা, তুমি চটি সাহেবের কি কাজ কর্তে? তাঁর জিনিষ পত্র আসবার বোধ হয় ভেসে চূরে তচনচ্ কর্তে?”

“আজ্ঞে, সব নয়। তার সব কথাও আমার মনে নেই। তবে, এই গেল মাসে চারখানা চেয়ার, ছটা গ্লাস, চারটা ল্যাম্প—এই তচনচ্ করেছি।”

“তাঁকে আস্ত রেখে এসেছ তো?”

“আজ্ঞে হাঁ।—না—না—হজুর, ঠিক আস্ত নয়, তিনি বড় অসুস্থ।”

“অসুস্থ! কেন, কেন, কি সে?—জ্বর হয়েছে, না অন্য কিছু অসুখ?”

“আজ্ঞে, তা বলতে পারিনি, হজুর! তবে দেখি, তিনি খালি কবিতা লিখছেন।”

“তবে তো ভারি অসুখ! আচ্ছা, তুমি তাঁকে ছাড়লে কেন?”

“আমি ছাড়ব কেন, হজুর? তিনি আমাকে ছাড়লেন।”

“কেন? তিনি তোমাকে ছাড়লেন কেন?”

“আজ্ঞে, তা তো আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। একদিন তিনি সন্ধ্যার পর বসে থাকেন, আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে

আছি। হঠাৎ তিনি চৈঁচিয়ে ব'লে উঠলেন—মারো, মারো।
—আমি আর স্বিকৃতি না ক'রে তাঁকে ষা কতক দিয়ে দিলুম।
তিনি রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বুললেন—‘ফুল! আমাকে মারুছিস্
কেন?—মারুলি যে?—আমি তোকে, আমাকে মারতে
বলেছি? রোজ ঐ বেরালটা দুধ খেয়ে যায়—দেখিস্নি?’

মিস্ চপলা মুখে রুমাল গুঁজিয়া হাসিয়া কুটিপাটি হইয়া
একেবারে ফাটিয়া পড়িবার যোগাড়! আমি বলিলাম,—

“বলুন তো, হুজুর! আমি ফুল হলাম কিসে?”

“কেন? ফুল তো ভাল। তোমায় ফুল বলেছেন।”

“হুজুর! আমাকে ও ব'লে ঠাণ্ডা করলে চলবে না।
সাহেবদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে লিখতে পড়তে না জানি, ইংরেজি
কথা দু'টো চারটে শিখেছি। ফুল মানে আহাম্মক হুজুর!”

“তার পর মার খেয়ে তোমার চটি সাহেব কি করলেন?”

“আজ্ঞে, এক পেয়লা গরম দুধ খাচ্ছিলেন, সেইটে আমার
গায় তেলে দিলেন।”

“তুমি কি করলে?”

“আমি বললাম,—হুজুর! দুধটা গায় তেলে দিলেন কেন?
আমার গালে তেলে দিলেই তো পারতেন।”

“ঠিক তো। এখন বোঝ, তুমি ফুল না তোমার চটি সাহেব
ফুল। হাঁ—তার পর কি হ'লো?”

“চটি সাহেব বুললেন, তুই আর এখানে থাকিস্নে।”

মিস্ চপলা বলিলেন,—“তা হবে না।—হাঁ—তোমার
নাম কি?”

“আজ্ঞে—আজ্ঞে—এই—”

“মনে পড়ছে না নাকি ?”

“আজ্ঞে হাঁ, মনে পড়ছে, একটু একটু—”

“একটু একটু কি ? পুরো নামটা মনে নাই ?”

“আজ্ঞে, আছে বই কি হুজুব যে তাড়া কচ্ছেন !”

“আচ্ছা, তোমার মনে করতে হবে না। আমি তোমায় ‘দাদাভাই’ বলে ডাকব। দেখ দাদাভাই, সেই চটি সাহেবের কাছে তোমায় যেতে হবে। তিনি তোমায় দেখে কি বলেন, কি করেন, এসে আমায় বলতে হবে।”

“আমি তাঁকে গিয়ে বলব, আপনি পাঠিয়েছেন ?”

মিসু চপলার মুখ আবার রাঙ্গা টুকটুকে হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগে নয়। তাড়াতাড়ি বলিলেন,—

কখনো না—খবরদার না—আমার নাম ক’রো না।”

“তবে তাঁকে কি বলব ?”

“বলবে আবার কি ! এই যেন তাঁর অসুখ, আর তুমি তাঁকে দেখতে গেছ। কিন্তু আমাকে এসে বলতে হবে, তিনি কেমন আছেন, কি কচ্ছেন, কি বললেন।”

আমি ইহাই চাহিতেছিলাম। আদরের ‘দাদাভাই’ সম্ভাষণ ইহারই জন্ম। এ রমণী সত্যই আমার বন্ধুবরকে ভালবাসে। তাহার জন্ম ইহার প্রাণ সমবেদনায় কাঁদিতেছে। তাই সে কেমন আছে বা কেমন থাকে, খবর লইবার জন্ম এত ছল—এত কৌশল করিতেছে।

শক্তি মূর্তি স্থাপনা করিতে গেলে ভৈরব চাই, আর শিব

স্থাপনা করিতে গৌরিপট্ট আবশ্যিক। আমি এই ভৈরব ভৈরবীকে স্থাপনা করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিব। বেলা মোহিতের ঘটকালিতে আমার পসার খুব বাড়িয়া গিয়াছে। অকস্মণ্য লোক, চাই কি এ ব্যবসায়টা করিয়াও দিন গুজরাণ হইতে পারে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কাছে এই সুযোগে ঘটকালির আর্জিটা পেশ করিয়া রাখিলাম।

এখন দ্বারিক চট্টরাজকে স্বচক্ষে একবার দেখিতে হইবে। দক্ষ সেনাপতি যুদ্ধের পূর্বে দেশ কাল পাত্র স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিয়া কার্য্য করেন। আমি দ্বারিকের সহিত পরিচয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দ্বারিকের বাড়ী লাহোর সহরে নয়, সহরতলীতে। এদিকে আমার আনাগোনা কালে ভদ্রে। লাহোরে আমার পুরুষানুক্রমে বাস, কিন্তু আমি কিছুই চিনি। চিনি কেবল মাকে আর আমার ক্লাবের বন্ধুদের। আর সম্প্রতি কিছুদিন আগে একটি রত্ন চিনিয়াছি—আমার সেই ঠাকুরদাকে।

যাহা হউক খুঁজিয়া বাড়ী ঠিক করিলাম এবং সেই দিনই সন্ধ্যার পর কপাল ঠুকিয়া দ্বারিকের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। চট্টরাজ তখন ‘সুধা পানে চল চল!’ আমাকে দেখিয়াই সে বলিল,—

“কে বাবা! যমদূতের মতো এসে দাঁড়ালে? এখন স’রে পড়, আমরা একটু ফুর্তি করছি। খোঁয়াড়ির সময় এসো।”

শৃগালের ঐক্যতান বাদনের গায় চট্টরাজের পাঞ্জাবী ইয়ার-বর্গ ছয়া ছয়া করিয়া রকম রকম সুরে হাসিল। আমি বলিলাম,—

“আমি ঘটকালি ক’রে থাকি।”

বাবু বলিলেন,—

“বলছি এখানে কিছু হবে না। স’রে পড় না বাবা!”

“ভ্জুর। আমি ভিক্ষে করতে আসিনি, ঘটকালি করতে এসেছি।”

“ও-ও-ও—ঘট-ঘট-ঘটকালি! জয় মা, ঘটকালি! জয় মা, ঘটকালী! জয় মা, রক্ষাকালী!”

বলিয়া মাতাল আমার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল,—

“মা ঘটকালি, আমার বে হ’য়ে গিয়েছে! কেবল মা বেটা বজ্জাতি ক’রে বোঁ ঘরে আনছে না? তুমি যদি আমার বোঁ এনে দিতে পার, আমি শনিবার অমাবস্তুর ভৈরবী চক্র ক’রে (হাতে সাপের ফণা দেখাইয়া) তোমায় পেট ভরে মদ পাঁটা দিয়ে পূজো দেব।”

আমি বলিলাম,—“তথাস্তু! কাল ছপুর বেলা আমি আসব?”

মাতাল বলিল,—“একেবারে বোঁ সঙ্গে নিয়ে।”

“তথাস্তু!”

বাবু উঠিয়াই নাচিতে আরম্ভ করিলেন,—“উর-র-র বোঁ আসবে ঘটকালী! উর-র-র বোঁ আসবে ঘটকালী!”

সঙ্গে সঙ্গে ইয়ার বর্গও নাচিতে লাগিল। আমি সেই অবসরে প্রস্থান নয়—পলায়ন করিলাম। সর্বনাশ! এই বেলেলা বেল্লি-কের হাতে চপলা! ভৈরব ভৈরবীর চক্র! মা ঘটকালী, তা যদি হয়, তা হ’লে তোমার কাছে জোড়া নর-নারী বলি দেব।

৬

পরদিন বাড়ীতে খাইতে আসিবার ছুটি পাইলে আমি দ্বারিকের নিকট গেলাম। তখন তাহার অবস্থা গতকল্যকার চেয়ে কিছু ভাল, কিন্তু মুখে গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে! আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—“কে তুমি?”

আমি উত্তর দিলাম,—“আমি কাল আসিয়াছিলাম, ঘটকালি করিতে।”

বাবু বলিলেন,—“ঘটকালির মতো ঘটকালি করতে পার তো বে করতেও রাজি, বখশিস্ দিতেও রাজি।”

জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কি রকম ঘটকালি আপনি চান?”

“রকম সকম আমি বুঝি না। আমি চাই চপলা গাঙ্গুলীকে বে করতে।”

আমি মনে মনে বলিলাম—“আর সে চায় তোমার মুখে ঝাড়ু মারিতে।”

আমার মনে হইল, এই ম'দো মাতালের মুখে চপলার নাম উচ্চারিত হইয়া কলঙ্কিত, অপবিত্র হইয়াছে।

বাবু বলিলেন,—“কি, একেবারে চক্ষুস্থির! ব'লোছি তো তোমার কৰ্ম নয়!”

“আমার কৰ্ম নয় তো কার কৰ্ম? মিঃ গ্যাঙ্গুলী তাঁর মেয়ের সম্বন্ধের সমস্ত ভার আমার উপর দিয়েছেন।—আমার কৰ্ম নয়! কি, আমি না সম্বন্ধ করলে, সে মেয়ের কে বে দেয় দেখবো!—হঁঃ, আমার কৰ্ম নয়!—বেশ, আমি চল্লুম।”

আমি চলিয়া আসিবার ভান করায় চট্টরাজ বলিল,—

“চটো কেন ?—আ-হা-হা—শোনোই না। বলি—”

“আর বলাবলি কি মশায় ? আমি কথা না পাড়তেই আপনি ব’লে বসলেন—তোমার কর্ম নয়। নয় তো নয় !”

“আচ্ছা, বাবা ষাট হয়েছে। বলছি—তোমার কর্ম—তোমার কর্ম—তোমার কর্ম—এই তিন সত্যি করলুম !

মাতাল ক্রমেই পাকিয়া উঠিতেছে। আমি দেখিলাম, কাজ বাগাইবার এই সময়। বলিলাম,—

“আমাদের চটাচটি কি বাবু,—গরীব লোক, একটা সম্বন্ধ পাকাপাকি করতে পারলেই দু’পয়সা পাব !”

বাবু বলিলেন,—“দু’পয়সা কি ! আমি তোমাকে দুশ মোহর দেব। কিন্তু বাবা এক যায়গায় বাধছে।”

“কি, গিন্নী মা ধরজামাই হ’তে দিতে রাজি হচ্ছেন না !”

“ই-য়া, ইয়া, ইয়া ! তুমি ঠিক বুঝেছ। সব জানো দেখছি ! বল তো, বাবা ষটকালী ! তোমার গিন্নীমাকে নিয়ে এখন কি করা যায় ?”

“আজ্ঞে হুজুর, সে ভার আমার। গিন্নীমাকে বুঝিয়ে রাজি করবার ভার আমার।”

“কে বাবা তুমি সুবচনীর হাঁস ! বাবা হংস, আমাকে বর দাও, যেন ড্যাং ড্যাং ক’রে গিয়ে চপলা গ্যাঙ্গুলীর বর হয়ে বাসরে ব’সতে পারি।”

এই সময় কাজ আদার না করলে বেটা ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিবে। বলিলাম,—“বাবু, সন্ধ্যার পর চালাবেন এখন। এখন কাজটা পাকাপাকি হোক।”

“একটু পেকে পাকাপাকি করলে হবে না?”

আমি হাত ঘোড় করিয়া বলিলাম,—

“মাপ করবেন ! সে ব্যারিষ্টার, তাঁর কাছে কাঁচা চাল চলবে না।”

মাতাল বলিল,—“তাই তো বুদ্ধিতে পাক ধরাচ্ছিলুম ! আচ্ছা, তুমি বললে,—এই গেলাস নাবিয়ে রাখলুম। কি করতে হবে, বল বাবা মঙ্গলচণ্ডী ! এই গেলাসের চার পাশে গণ্ডী দিলুম। এখন আর ছোঁব না—ধাব না। খাই যদি তো গোরস্ত, ব্রহ্ম-রস্ত !”

বলিয়াই ছোঁ মারিয়া গেলাস তুলিয়া লইয়া চোঁচা পান করিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম,—“দোহাই বাবু, একটু ধামুন।”

“থেমেছি তো। দিব্যি ক’রেছি, তোমায় কথা দিয়েছি, আর খাই ? কি বল ? মা বেটিকে রাজি করতে পারবে ?”

“হুজুর, গিন্নীমাকে পরে এক সময় রাজি করলেই হবে। আপনি আগে তো বিয়ে ক’রে ফেলুন।”

“ঠিক বলেছ ! তোমার বড় জ্বর মৎলব ! এক গেলাস খাও, আরো মাথা খুলবে।”

“হুজুর, আমার মাথার চারদিক খোলা। দরজা জানালা, খড়খড়ি, সাসি—সব একেবারে হাট ! আর খুললে, যেটুকু বুদ্ধি আছে, সব উড়ে যাবে।”

“বন্ধ ক’রে দাও—বন্ধ ক’রে দাও ! খবরদার বলছি, বুদ্ধি যেন উড়তে দিয়ো না। কি বল, আগে বিয়েটা ক’রে ফেলা

যাক্। তার পর সময়মত গায় হলুদ হবে।—কেমন ?—তুমি আচ্ছা মৎলববাজ !”

“হাঁ হুজুর ! কিন্তু একটা যে বড় গোল বেধে আছে ?”

“আবার কি গোল ! আরে ছ্যাঃ—কোথায় আকাশপির্দিম আর কোথায় গঙ্গা-ফড়িং—একেবারে ঘাসের ওপর চিৎপাৎ ! তোমার কি একটু দয়ামায়া নেই ? কি দাগাটা দিলে বল দিকি !”

“আজ্ঞে বাবু, দাগা কি ? কিসে দাগা ? আপনি তো আপনার বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি সব লিখে দিতে রাজি ?”

“কাকে ? তোমাকে ? অন্তরা ভাঙ্গ না, বাবা !”

“আমায় কেন, হুজুর ?—চপলা গাঙ্গুলীকে ।”

“আলবৎ ! শুধু বিষয়-সম্পত্তি কি, চপলা গাঙ্গুলীকে আমি দাসখৎ লিখে দেব, তার বুড়ো বাপকেও দেব, তোমাকেও দেব । তুমি আমার বৌ এনে দাও । চপলাকে দিও, আর কিছু মদের খরচ দিও, বেশী নয় বাবা, রোজ চার বোতলের দাম দিও ।”

“সে সব ঠিক হবে । আপনি ঠিকানা লিখে দিন না !”

“বেশ, কাগজ-কলম নিয়ে এস ! দাওয়ানখানায় যাও ।”

আমি তৎক্ষণাৎ গিয়া দোয়াত, কলম, কাগজ, ধাম আনিলাম । বাবু বলিলেন,—“লেখা ।”

আমি বাললাম,—“হুজুর, এ প্রণয়পত্র, আপনি নিজে হাতে লিখুন ।”

হুজুর বলিলেন,—“আমি কোনো কালে লিখিনি, খালি সহ

করি। জানো চাঁদ ষটকালী,—বড় মানুষী কেতা শেখ। সরকার লেখে, বড় লোক সই করে। সই মক্শো করতে তিন রিম্ কাগজ গেছে! লেখ বাবা লেখ, আমি সই ক'রে দেব। লেখ —‘মেরী পিয়ারী, আমি তোমার নয়ন-কুঞ্জের দোয়ারী’।—”

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই আছ্লাদে আটখানা। নাচিল না, কেননা, এখনও তত নেশা হয় নাই। বলিতে লাগিল,—

“হায়, হায়! কেয়া কহে না!—দোহা বন্ গিয়া, ভেইয়া! মেরী পিয়ারী, আমি তোমার চরণ-কুঞ্জের দোয়ারী।—দোয়ারী —যেমন রাখার কুঞ্জে পাহারা—চুড়ো বাঁধা দোয়ারী—দরো-য়ান। আবার এদিকে দোয়ারী কিনা—আমি দ্বারিকপ্রসাদ চট্টরাজ।—সাবাস!—সাবাস!—কেয়া দেলখোস! কি বল, বাবা ষটকালী, কেমন? কবি কিনা, বল? ছটো বাহবা দাও, বাবা—নইলে ছাতি হবে কেন?—ছাতি বাড়াও! বাবা ষট-কালী, দেখো বাবা, যেন শেষ বলতে না হয়—বেটা ষট্ কালী! বাহবা! আজ কেয়া বখ্ত! আমার নাচতে ইচ্ছে কচ্ছে।”

আমি সতয়ে তাড়াতাড়ি বলিলাম,—

“বাবু, চিঠিখানা শেষ ক'রে ফেলুন তার পর নাচবেন।”

“আচ্ছা, বাবা ষট্ কালী, কিছু ডরু নেহি—আমার নেশা,— হয়নি—কি বল?—হাঁ—কতদূর হয়েছে?”

যতদূর হইয়াছে, আমি পড়িলাম। মাতাল বলিল,—

“হাঁ, মেরী পিয়ারী, আমি তোমার দশন-কুঞ্জের দোয়ারী! তুমি আমার খোয়ারী! ষট্ কালী বাপ, আমার বুক ফেটে

যাচ্ছে— আমার হার্ট ফেল্ হচ্ছে ! ওঃ, আমি এমন বাহাদুর তা জানতুম না ! আমি বাঁচব না !” বলিয়াই ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল ।

আমি বলিলাম,—“খুব বাঁচবেন ! নিদেন চিঠিখানা লিখে মরুন !”

“আবার কি লিখিব ? লেখার চূড়ান্ত করেছি ! তোমার বাংলা দেশ, যেখানে কবির আড়ং—সেখানে কোন্ ব্যাটা কবি আছে, আমার মতন লিখতে পারে ? আমি আর বাঁচব না ! বাবা ঘটকালী, আমি আর বাঁচব না !”

আবার বিকট স্বরে ক্রন্দন । আমি বলিলাম,—

“বলাই, বলাই ! ষাট ষাট আমার বঞ্জীর দাস, ষেটের বাছা !”

“বাঁচবো ? ঠিক বাঁচবো ? একটুও মরুব না ?”

বলিয়াই মাতাল ভূমিষ্ঠ হইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল ।

আমি বলিলাম,—“ও চিঠি তো লিখলেন চপলা গাঙ্গুলিকে এখন তার বাপকে তো একখানা লিখতে হবে !”

মাতাল বলিল,—“আমার দায় পড়েছে ! সে ব্যাটা আমার কে যে তাকে চিঠি লিখিব ?”

“হজুর, তাঁকে না লিখলে, তিনি বৌ পাঠাবেন কেন ?”

“বটে, বটে ! ব্যাটা এত পাজি ! না লিখলে বৌ পাঠাবে না ? ব্যাটার কি দারুণ জেদ রে বাপ ! ব্যাটা কোণ্ডলি কি না । জেরায় জব্দ করবে ? তা হচ্ছে না বাবা ! আমিও ছাড়ব না !”

“তাই তো বলছি হজুর ! মিষ্টার গাঙ্গুলীকে একখানা চিঠি লিখে দিন !”

“আমার ব’য়ে গেছে ! দরকার হয়, তুমি লেখ ।”

“আপনি সহই ক’রে দেবেন, কেমন ?”

“একটা সহই কেন বাবা, আঙু-পিঠে সহই করুব। জান না, তিন রিম কাগজ মক্শ করে সহই করা শিখেছি ! লেখে ফেল না বাবা ? যা লিখবে, ঝট্পট্ লিখো চট্পট্ বো এনে দাও। আমি স্নান ক’রে, খেয়ে একটু ঘুমুই। নইলে বাসর জাগুব কেমন ক’রে ?”

“তবে পিয়ারীর চিঠিখানা সহই করুন ।”

বলিয়া আমি দ্বারিক চট্টরাজের হাতে কলম দিলাম। আমার দেখার উদ্দেশ্য, সহইটা ঠিক করিতে পারে কি না। দস্তখৎ ক’রে এদের এমন অভ্যাস হইয়াছে যে, কোন অবস্থাতেই বেঠিক সহই করে না। দস্তখৎ ঠিক ঠিকই করিল। সে চিঠিখানা লইয়া আমি বলিলাম,—“তবে মিষ্টার গাঙ্গুলার চিঠিখানি আমি লিখি, আপনি সহই ক’রে দেবেন। তাতে কিন্তু ইংরেজি দস্তখৎ করিতে হবে।”

হুজুর বলিলেন,—“আলবৎ ! ইংরিজি সহই আমি পারি নি ? আচ্ছ বাবা, তুমি লেখ। আমি এমন সহই ক’রে দেব, কোন শালা বুঝতেও পারবে না, পড়তেও পারবে না যে—ডি, পি, চট্টরাজ ! কেবল ইক্ড়ি-মিক্ড়ি চাম্চিক্ড়—চামে কাটা চট্টরাজ ! বাংলা দেশে এমনি একটা খেলা আছে না ? হ্যাঁ বাবা ! মিছে কথা ব’লো না নরকে যাবে। ইংরিজি সহই কেবল ইক্ড়ি-মিক্ড়ি। আমি কি জানিনি ? বোকা পেলে ? ব্যাটারা ইচ্ছে ক’রে সহই করে, কেউ নাম না পড়তে পারে। হাঁ—হাঁ বাবা ষটকালী

বোকা পেলে ? দস্তখৎ করুব ঠিক হাঁসের ডিম আর কাঁকড়া !
বাবা ! দেরী করুছ কেন ? আমার মাথা খাও, লেখ আমার
দিব্যি লেখ, তোমার পায়ে পড়ি লেখ ।”

‘All is fair in love and war’—এই মহামন্ত্র জপিতে
জপিতে আমি লিখিলাম “My dear Sir, আমি আপনার কন্যার
পাণিগ্রহণ প্রার্থী । যদি আপনার মত হয়, আমি আমার সমস্ত
সম্পত্তি আপনার কন্যার নামে লিখিয়া দিব । আর আপনার
বাটীতে পুত্রের ন্যায় যাবজ্জীবন বাস করব ।”

চিঠি সহই হইল । আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম । আসিবার
সময় চট্টরাজ বলিতে লাগিল,—“দেখ বাবা ঘটকালী, বৌ নিয়ে
সটুকালি না হয় ।”

আমি বলিলাম,—“না । আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি
আপনি এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব ।”

“কেন, কেন ?”

“বৌ আনুবার জন্ম ।”

বলিয়াই দ্রুত প্রস্থান করিলাম ! পাছে আবার নৃত্য আরম্ভ
করে ! কি পাপ !

৭

আমি আহায়াস্তুে অপরাহ্নে মিষ্টার গাজুলীর বাংলার গিয়া
ঠাহার টেবিলের ওপর চিঠিখানি রাখিলাম ।

এমন সময় মিস্ চপলা ডাকিলেন,—“দাদা ভাই !”

আমি কাছে যাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“দাদা ভাই, তোমার বাড়ী এখান থেকে অনেক দূর ?”

আমি উত্তর দিলাম,—“হাঁ মিসি বাবা!”

“ও মা! মিসি বাবা কি! আমার ভাই নেই, তোমাকে ভাই দাদাভাই বলি। তুমি আমার দিদি বলবে।”

“তবে ছুঁরকে কি ছুঁরদিদি বলবে?”

“হা—হা—হা, হা—হা—হা—হা!”

কি মধুর! আমার মনে হইল, সেই বড় টেবিল-হারমনিয়মটা যেন সপ্ত সুরে বাজিয়া উঠিল! কি মধুর! কি সুন্দর! এঁরা কে? সত্যই এঁরা কুহকিনী, মায়াবিনী! সত্যই এঁরা মানবের গ্রীষ্মের বীজন, শীতের আবরণ, বর্ষার আচ্ছাদন, বসন্তের বিলাস! সত্যই এঁরা অবসাদের উত্তেজনা, শ্রমের আরাম, ক্ষতের প্রলেপ দেহের অর্ধাঙ্গিনী, গৃহের লক্ষ্মী, জীবনের আশ্রয়, সংসারের সার! এঁরাই সৃষ্টির চরম গৌরব! ব্রহ্মার মানস-ছাব! বিচিত্র কি, এঁদের তুষ্টির জন্ম নর সৃষ্টিচিন্তে শ্রম করে! এক তিল হাসি দেখিলে সকল শ্রম সফল হয়! এঁদের এক বিন্দু অশ্রু হরণ করিবার জন্ম অকাতরে প্রাণ দেয়! এঁদের রক্ষণের জন্ম দুষ্কর সম্মুখে শত্রুর গোলার মুখে আত্মসমর্পণ করে। চপলার হাসির রেশ তখনও আমার কানে বাজিতেছে। সে বলিল,—

“আমি তোমায় দাদা ভাই বলি, তুমি আমার বলবে চপলা দিদি, কেমন?”

“আচ্ছা।”

“দাদা ভাই, তোমার মা কেমন?”

“মা? মা-ই আমার সব।”

হঠাৎ দিদির মুখখানি মলিন হইল। চোখ দুটি ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। কপোল বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

একটা রূপকথা শুনিয়াছিলাম, হাসিলে মাণিক, কাঁদিলে মুক্তা করে। আজ আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। একটি মৃদুশ্বাস ত্যাগ করিয়া চপলা বলিল,—“আমার মা নাই !”

মা নাই ! আরে অভাগিনী তোমায় নিয়ে গিরে আমার মায়ের কোলে বসাতে পারুহুম ! বুঝ্‌তে, মা কেমন ! মা নাই ! তুমি সত্যই হতভাগিনী ! তোমার হৃদয়ের নীরব বেদনা বুঝ্‌বে কে ? অন্তর্যামী ? তিনি কি বোঝেন ? কই, বুঝ্‌তে তো পারি না ! তিনি যদি বোঝেন, তবে এ ধরার এত হাহাকার কেন ? ঐ যে, তপ্তশ্বাস ঝঙ্কা-বিতাড়িত ফুর্ত অশ্রু-বিন্দুর স্তব্ধ কল্লোল ! মা নাই ! মা নাই ! যখনই শুনি, কেহ বলে—আমার মা নাই ! আমার তখনই মনে হয়, এ হত-ভাগ্যের চক্ষে এই সোনার সংসার অন্ধকার ! ইহার পক্ষে এই গুামলা, কুমুমকুণ্ডলা মেদিনা মরুভূমি ! এ অভাগা স্নেহের কোন্‌ অকালের অনাবৃষ্টির দেশ হইতে আসিতেছে ! ইহার অন্তরের বুভুক্ষা অনিবার্য্য, তৃষ্ণা দূরপনের ; ইহার হৃদয় শুষ্ক, জীবন দুর্ভাগ, সংসার বিষাদ !— ইহার মা নাই !

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া চপলা বলিল,—

“দাদা ভাই, তুমি চটিসাহেবকে দেখতে গিয়েছিলে ?”

এ কক্ষে বিষাদের ভার গলিয়া আসিতেছে—ইহা দূর করিতে হইবে।

আমি বলিলাম “হাঁ, হুজুর চপলা দিদি !”

তখন মুক্তার প্রস্রবণ বন্ধ হইয়া মাগিক ঝরিল—হা—হা—হা !

“হা—হা—হা—আবার বলে ছুঁর ! শুধু চপলা দিদি ।—
সাহেব কি কচ্ছিলেন ?”

“দীর্ঘনিঃশেষ ফেল্ছিলেন শুধু চপলা দিদি ।”

আবার অক্ষয় মাগিকবর্ষণ । সঙ্গে সঙ্গে সুধাস্বর—“দেখ, তুমি
ভারী বোকা ! আমার ভারী দুঃখ হয় । মনে হয়, তোমার মা
না থাকলে, কি হতো ? তুমি কিছু জান না । শুধু চপলা দিদি
কেন ?—চপলা দিদি । শুধু দীর্ঘনিঃশাস ফেল্ছিলেন আর
কিছু না ?”

“আর চোখ্ ছল ছল কচ্ছিলেন ।”

“বটে, বটে ! ঝড়-বাদল দুই-ই !—লক্ষণ তো বড় মন্দ ! তার
পর আর কি করলেন ?”

“আর বল্ছিলেন—

হৃদয়-খান্নারে নিরাশ আঁধারে

চমকে চপলা ভাতি !”

কি ডাইনি গো ! সে মিন্বে মরুতে বসেছে আর এ পোড়ার-
মুখী কি না রসিকতা আরম্ভ ক'রে দিলে ! ওগো ঠাকুরগণ, আমার
যত বোকা ঠাওরিয়েছ, আমি তত বোকা নই, আমিও কিছু
কিছু বুঝি । সন্ধ্যার মেঘ চিরে যেমন গোধূলির আলো বেরায়,
তোমার এ রসিকতাও তেমনি !—যেন দারিদ্র্যের দৈতো হাসি ।

চপলা বলিল,—“দূর ! তুমি কি শুন্তে কি শুনেছ, দাদা-
ভাই ! চমকে চপলা ভাতি—নয়, কখনই নয় । ‘চপলা ভাতি’
নয়, বোধ হয় চড়ুইভাতির কথা বল্ছিল ।—Picnic party !”

আমি মনে মনে বলিলাম—“ঠিক তো। যেখানে horse অর্থে চপলা গ্যাঙ্গুলী হয়, সেখানে চপলা ভাতির পরিবর্তে চড়ুই-ভাতি না হবে কেন ?

চপলা বলিল,—“কেমন, নয় ? তুমি ভুলে গিয়েছ !”

আমি বলিলাম,—“আজ্ঞে হাঁ, ঠিক। তিনি ঐ ছটোই বলছিলেন। বলছিলেন—চপলা চড়ুইভাতি !”

“ও মা ! সে আবার কি ! তার পর কি বললেন ?”

“তার পর হঠাৎ চোখ চেয়ে আমার দেখতে পেয়ে বললেন—
তুই ব্যাটা আবার আমার ঠ্যাঙ্গাতে এয়েছিস্ ? পালা শালা।”

চপলার হাসিটি বড় মিষ্টি ! আমি বিভোর হইয়া শুনিত-
ছিলাম। সেই সময়ে মিঃ গ্যাঙ্গুলী কোর্ট হইতে আসিয়া আমার
ডাকিলেন। আমি সেলাম দিয়া দাঁড়াইলে টেবিলের উপর
দ্বারিকপ্রসাদের চিঠি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ চিঠি
কখন এলো ?”

আমি বলিলাম,—“হুজুর, খানিক আগে।”

তার পর কি ভাবিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন। আমি তাঁহার
পশ্চাত্তাগে অনতিদূরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, তিনি লিখিতেছেন—

My Dear Chattaraj,

আগামী কল্য সন্ধ্যার পর তুমি আমার সহিত সাক্ষ্য ভোজ
করিবে।

চিঠিখানি খামে পুরিয়া উপরে ঠিকানা লিখিলেন,—

D. P. Chattaraj Esquire,

আমায় বলিলেন,—“তুমি ডি, পি, চট্টরাজকে জান ?”

আমি বলিলাম,—“জানি, হুজুর।”

“তুমি সন্ধ্যার পর এই চিঠি তাঁকে দিয়ে বাড়ী চলে যেও।”

“যে আজে, হুজুর।”

সন্ধ্যার পর মিষ্টার গাঙ্গুলী নিত্য নিয়মিতরূপে বাংলোর সামনের বাগানে বসিয়া চপলাকে বলিলেন,—

“ম্যামি! (Mammy, গাঙ্গুলী প্রায়ই এই নামে চপলাকে সম্বোধন করিতেন) কা’ল সন্ধ্যার পর একটি বিশিষ্ট ভদ্র যুবক (যুবক কথাটার উপর জোর দিয়া) এখানে খেতে আসবেন ; দেখো, যেন অতিথিসংকারের কোন ক্রটি না হয়।”

চপলা বলিলেন,—“কা’ল বাবা ? কা’ল কেমন ক’রে হবে ?”

“কেন ? কি হয়েছে ?”

“না, কিছু হয় নি।”

“তবে ?”

“কা’ল আমার মাথা ধরবে !”

গাঙ্গুলী হো—হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “পাগলী পাগলামো করিস্ নি, তুই কি চিরকাল এই বুড়ো ছেলে নিয়ে আইবুড়ো দিন কাটাবি ?”

“কেন বাব, আমরা মারে ছেলেয় বেশ তো আছি !”

“চিরকাল কি এমনি থাকবে, মা ? আমি কি মরব না ?”

“বালাই ! ও সব কথা বল তো আমি উঠে যাব।”

বলিয়া চপলা উঠিয়া দাঁড়াইল। গাঙ্গুলী হাসিয়া বলিলেন,—

“না—না—বোস্। একজন যুবক খেতে এলেই তো আর তোকে বে ক’রে নে যাচ্ছে না। তোর মত না হ’লে আমি তোর

বে দেব না। তবে কি না, এঁরা খুব বড় বংশ, এঁদের অনেক বিষয়। সব তোঁর নামে লেখাপড়া ক’রে দেবে বলেছে! কথাটা ভাব্বার কথা। আমি তোঁ মা, এ পর্যন্ত একটি পয়সা রাখতে পারিনি, হঠাৎ শিল্পে ফুঁকলে তুই দাঁড়াবি কোথা? আচ্ছা, সে সব কথা পরে। কা’ল সে তোঁ আসুক, তুই দেখ্। হু তিন দিন দেখাশোনা ক’রে তোঁর যদি মত হয়, তবেই কথা।”

চপলা ষাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, কেবল বাহিরে নয়, ব্যথার ব্যথী হীনা এই কিশোরীর অন্তরেও। ইহার মা নাই!—হৃদয়ের জমাট বাঁধা অন্ধকার চোখের জলে গলাইয়া বন্ধে ঢালিয়া দিবে? দুঃখ যাহার বলিবার কেহ নাই, তাহার দুঃখ বড় দুঃখ! শান্ত হও দিদি, শান্ত হও। তোমার দাদাভাই আছে। যদি তোঁর বেদনার অশ্রু মুছাতে না পারি, তবে আমি তোঁর কিসের দাদাভাই?

মিষ্টার গ্যাঙ্গুলী ‘মৌনং সন্ন্যতিলক্ষণম্’ বুঝিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে আমায় চিঠিখানি দিয়া বলিলেন,—

“এই নাও—ডি, পি, চট্টরাজ,— চিঠি দিয়ে তুমি বাড়ী চ’লে যেও।”

“যে আজ্ঞে, হুজুর!”

কিন্তু সে দিন যে নাচ দেখে এসেছি! সন্ধ্যার পর আর সে মাতালের কাছে কে যায়? গ্যাঙ্গুলীর নিমন্ত্রণপত্র মাতাল ডি, পি, চট্টরাজকে না দিয়া আমার ব্যারিষ্টার বন্ধু ডি, পি, চট্টরাজকে দিবার জন্ত চলিলাম। আমি বোকা-সোকা মানুষ, অত কি

বুঝি ! আর এতে ক্ষতিই বা কি ? মাতালের বদলে আমার বন্ধু না হয় নিমন্ত্রণ খেয়ে যাবে ।

৮

বন্ধু ব্যারিষ্টারের বাড়ী গিয়া বলিলাম,—

“Line clear (লাইন্ ক্লিয়ার)—তুমি Whistle (হুইসল্) দিয়ে বেড়িয়ে পড় ।”

সে আমার মুখের পানে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল । আমি বলিলাম,—

“মিষ্টার গ্যাঙ্গুলী দ্বারিক চট্টরাজকে চেনে না—কখনো দেখেনি । কা’ল সন্ধ্যার পর ধাওয়ার অছিলায় চপলার সঙ্গে দেখা-শুনা করিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে । আমি অতি বোকা, তাই সে নিমন্ত্রণপত্র তাকে না দিয়া তোমাকে আনিয়া দিয়াছি । কা’ল মাতাল দ্বারিক প্রসাদ চট্টরাজের স্থলে হতাশ প্রেমিক দ্বিজপদ চট্টরাজ নিমন্ত্রণে যাইবে । গ্যাঙ্গুলী তো তোমাকেও চেনে না !”

বন্ধু বলিল,—“এ যে False personification !”

“রাখ তোমার False personification ! নিমন্ত্রণ পত্রে এমন কিছু নাই যে, বিশেষ করে দ্বারিককে বোঝায় । My dear Chattaraj, কা’ল এসে এখানে ভোজ খেও । তুমি এই চট্টরাজ নয় কেন ? তার পর চপলা,—দায়মুদ্রর রাজি তো কি করবে কাজি ? তাকে তোমায় এখন কিছু বলতে হবে না, অবশ্য প্রেমের কথা বলবে বই কি ! কিন্তু দোহাই তোমার Shakes-peare ঝেড়ো না ।”

বন্ধুকে নীরব দেখিয়া আমি বলিলাম,—“তা ভাই, তোমার যদি মনোমত না হয়, ত দাও, আমি নিমন্ত্রণপত্র সেই মাতাল ডি, পি, চট্টরাজকে দিয়ে আসি।”

ব্যারিষ্টার হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—“Arise, black vengeance from the hollow hell !”

এখানে black অর্থে সুন্দর, vengeance অর্থে চপলা, আর hell হচ্ছে প্রেম।—হে সুন্দর চপলা আমার, এস এস প্রণয়ের অন্ধকূপ হ’তে!

বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়া বিলাতী অনুকরণে এক পাক Polka নাচ নাচিয়া আড় হইয়া শুইয়া পড়িল। আমি বাড়ী চলিয়া গেলাম।

৯

সারা রাত ভাল নিদ্রা হইল না। গোলমাল, জড়িবুটি যতদূর পাকাইতে হয়, পাকাইরাছে। এক সুন্দরী কিশোরী, দুই প্রেমিক, অর্থগৃধু পিতা তার পর False personification fraud, Cheating, Breach of trust, পিনাল কোড্ (Penal Code) ওজড় হয়ে গেছে! এখন পরিণাম কি? পরিণাম মা-ই জানেন, আমি তাঁর চরণ স্মরণ ক’রে কাজে নেমেছি।

পরদিন আমার দর্শনমাত্রে মিঃ গাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“চিঠি দিয়েছ?”

“আজ্ঞে হুজুর!”

“কোন গোল করনি তো?”

“আজ্ঞে ডি, পি, চট্টরাজকে দিয়েছি, হুজুর!”

তিনি “Right” (রাইট) বলিয়া ব্রীফ পড়িতে লাগিলেন ।

অন্য সকাল হইতেই বাজারে ছুটোছুটি, তরকারী কোটাকুটির ধূম পড়িয়া গিয়াছে । বাংলা, ইংরেজী, মোগলাই, ফরাসী, মগ্ প্রভৃতি সকল জাতীয় খানাই প্রস্তুত হইবে । তার উপর গ্যাঙ্গুলী চপলাকে বলিয়াছেন,—“ম্যামি, তোমার হাতের পায়ের, সন্দেশ অনেক দিন খাইনি ।”—

উদ্দেশ্য ভাবী জামাতাকে দেখাইবেন, তাঁহার কণা কিরূপ রক্ষনপটু । চপলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করিয়াছে ।

বৈকালে চপলা আমায় বালিল,—

“দাদাভাই, আজ তুমি খাবে না ? এত খাবার তৈরি হচ্ছে । আমি পায়ের রেঁধেছি । বাবা মুখে ঐ রকম বললেন বটে, কিন্তু তাঁর মনের ইচ্ছা, আমার রান্নার গুণপনা যার তার কাছে দেখাবেন । ছিঃ, আমার লজ্জা করে ! যে সে খাক না খাক, আমার ব’য়ে গেল, কিন্তু তুমি খাবে ব’লে আমি উৎসাহ ক’রে রেঁধেছি । আমি কখনো ভাইফোঁটা দিতে পাইনি, ভাইকে আদর ক’রে খাওয়াতে পাইনি ! আজ দাদা ভাই, তোমাকে এখানে খেতেই হবে ।”

মুক্তিমতী মেহরুপিনী করুণাধারা ভগ্নী আমার ! আমারও যে সহোদরা নাই ! ভগ্নীমেহ কেমন জানি না ! আমার চোখ ছুটো ছল্ ছল্ ক’রে উঠলো । বুঝি সে তা দেখতে পেরেছিল । উৎসুক নেত্রে আমার মুখপানে চেয়ে রইল । কি অযাচিত মেহের সহস্র ধারায় এ আমায় অভিষিক্ত করছে, শত বন্ধনে আমায় বাঁধছে ! আমাকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া সে একটু

অভিমানজড়িত কাতর স্বরে বলিল—“খাবে না’ দাদাভাই?”
আমিও অতি মৃদু কণ্ঠে বলিলাম,—“আমার যে মা আছেন,
দিদি! আমি সঙ্গে না খেলে, তাঁর খাওয়া হবে না!”

“আমি ভুলে গিয়েছিলুম, দাদাভাই!”

আওয়াজটা ভারী ভারী!

“না দিদি, তুমি অমন ক’রে আমায় তাড়ালে হবে না। তুমি
খাবার দিয়ো, আমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে মার কাছে ব’সে খাব।”

সে হাসিয়া বলিল,—“আচ্ছা তাই হবে, দাদাভাই!”

সন্ধ্যার পর ব্যারিষ্টার উপস্থিত হইলেন। চপলা যেন
আকাশ হইতে পড়িল। কিন্তু কিছুই বলিল না। অতি আদরে,
অতি যত্নে অতিথি সংকার করিতে লাগিল। বৃদ্ধ গ্যাঙ্গুলী যার
পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল। ব্যারিষ্টার নিত্যই
অপরাজে আসে এবং খাওয়া-দাওয়া করিয়া বাড়ী যায়। গ্যাঙ্গুলী
যাহাকে নির্বাচন করিয়াছেন, চপলা যে তাহাকেই মনোনীত
করিয়াছে, ইহাতে বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

একদিন কোর্ট হইতে আসিয়া বৃদ্ধ দূর হইতে অনক্ষিতে
দেখিলেন, কণ্ঠা তাঁহার নির্বাচিত জামাতার বক্ষে একটি
গোলাপ পরাইয়া দিতেছে। দূহিতার মুখের ভাব দেখিয়াই বৃদ্ধ
বিড় বিড় করিয়া ভাবিতে লাগিল,—একদিন আমারও এমনি
দিন গিয়াছে! এর সঙ্গে বে হ’লে বোধ হয় ম্যামী সুখী হবে
অর্থ-কষ্ট কখনো পাবে না—এর টাকা-কড়ি বিষয় অনেক
কথাবার্তা চুকাবার এই উপযুক্ত সময়। আজই রাত্রে।

তার পর চট্টরাজকে বলিলেন,—“আজ আহারাদির পর তোমার সঙ্গে কোন বিশেষ কথা আছে।”

এই কথায় আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। স্কন্ধমূত্রে যে খড়্গা বুলিতেছিল, তাহা পতনোন্মুখ হইয়াছে, আজ রাত্রে সে নিজে বলি গ্রহণ করিবে। আমি তৎক্ষণাৎ বিশেষ প্রয়োজন জানাইয়া ছুটি লইয়া ছুটিলাম—দ্বারিকায়।

সেখানে পৌঁছিয়াই দেখিলাম, দ্বারিক তখন সুরাসিন্ধুর মাঝখানে সাঁতার দিতেছে, কিন্তু একেবারে ডুবে নাই। আমি বলিলাম,—“আগনি করছেন কি? এখনি যেতে হবে!”

সে কয়েকবার হেলিয়া ছলিয়া সুরা-চুপুচুপু চক্ষে আমায় নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—“কে বাবা ঘটকাণী? সট্‌কালি বাবা, সট্‌কালি!”

“সট্‌কালি কি?—এঃ—আপনি সব মাটি করলেন দেখছি। মিষ্টার গ্যাঙ্গুলীর এখন বেশ ক্ষুণ্ণের নেশা হয়েছে। আমায় বললেন,—লে আও চট্টরাজ, আজই আমি এস্পার কি ওস্পার করব।”

মাগাল সহসা ভীত হইয়া বলিল, “এস্পার ওস্পার কি বাবা, খুন করবে না কি?”

“ক্ষেপেছেন! জামাই করবে ব'লে নিয়ে গিয়ে খুন! তা আপনার যদি এত ভয় হয়ে থাকে, আমি চলুম।”

“দাঁড়াও না বাবা! তোমরা সবাই অমন ক'রে তাড়াতাড়ি করলে বাঁচব কেন? একটু ভাবতে দাও বাবা!”

“বেশ, আপনি ভাবুন, আর ওদিকে আর একজন আপনার পিয়ারীকে বে ক’রে বৌ নিয়ে পালাক্ !”

“বল কি ! পালাবে ! তবে চল ! উঠাও পাকী ! কি বাবা, বাজনা-বাড়িও সঙ্গে নেব না ?”

“অত দেরী সহবে না। চলুন, আমরা রাস্তার মুখে বাজনা বাজাতে বাজাতে যাব এখন।”

“আলোও নেব না ?”

“আজ্ঞে, আপনিই আলো করে যাবেন, আবার আলো কি ? তা থেকে বরং দু বোতল ছইস্কি নিন্।”

“সাবাস ! সাবাস ! এই—ওরে—বউ আনুতে যাচ্ছি, বাজা বাজা।” বলিয়া আপনিই মুখে বোল ধরিল,—উর্-র্-র্ দাদাগো, উর্-র্-র্ দিদিগো, দোনার প্রতিমেথানি কোথা ফেলে এল গো।”

আমি মনে মনে বললাম,—তথাস্তু। এই বিসর্জনের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমারও বিসর্জন হয়।

সর্বনাশ করলে ! পথে আসিতে আসিতে মাতাল, চীৎকার করিয়া উঠিল—পেয়েছি, পেয়েছি ! আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম—“কি—কি ?” মাতাল বলিল,—

“টোপর ! টোপর নইলে যে বে হয় না, বাবা ঘটকালী ! বর কনে নইলে চলে, কিন্তু টোপর চাই—চাই-ই—চাই !”

বলিয়া রাস্তায় একটা ছোট্ট কেল হাঁড়ি পড়িয়া ছিল, মাতাল তাড়াতাড়ি সেটা কুড়াইয়া লইয়া মাথায় দিয়া বলিল—
“বাজা বাজা রগ্-র্ বাজা—উর্-র্-র্ ভেট্-কী মাছের তিনখানি

কাঁটা”;—এমনি করিতে করিতে চলিল। মাঝে মাঝে আমায় বলিতে লাগিল,—“খাম্লে কেন, বাবা ঘট্‌কালী, বাজাও না! হাত ব্যথা কচ্ছে?”

১০

যখন মাতালকে লইয়া আমি গ্যাঙ্গুলীর বাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সবে মাত্র আহারাদি শেষ হইয়াছে। চপলা তাহার নিজ কক্ষে চলিয়া গিয়াছে। বোধ করি, পিতা পাত্রের সহিত গোপনীয় কথা কহিবেন বলিয়াছেন, সেই জন্ত। সিনিয়ার ও জুনিয়ার ব্যারিষ্টার একখানি গোল টেবিলের দুই দিকে দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছেন। টেবিলের উপর চুরুটের সরঞ্জাম। সিনিয়ার চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন,—“I say Chatteraj—” ঠিক সেই সময়েই কেলে হাঁড়ি মাথায় মাতাল উপস্থিত হইয়া বলিল,—

“এই যে বাবা শ্বশুর মশায়! তোমার বর হাজির!—এই, বাজা—বাজা—উর্-র্-র্ ভেট্‌কী মাছের তিনখানি কাঁটা—”

তারপর হঠাৎ খামিয়া বলিল,—“শ্বশুর মশাই, প্রাতঃ-পেন্নাম।”

শ্বশুর মহাশয়ের হাত হইতে চুরুট অনেকক্ষণ পড়িয়া গিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া অতি ধীর অথচ কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কে তুমি?”

মাতাল বলিল,—“চোখ রাঙ্গাও কেন বাবা? ভয় করে যে? চোখ রাঙ্গিয়া না বাবা, একটু সাম্‌লাতে দাও—সারা পথ বাজাতে বাজাতে আসছি। মাল সঙ্গে এনেছি বাবা! দু

পাত্তোর ভূমি খাও, এক পাত্তোর আমায় দাও । মাল এনেছি,
এই নাও ।”

বলিয়া ছইন্ধির বোতল টেবিলের উপর রাখিল ।

শশুর পুনরায় উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কে ভূমি ?”

“কেন বাবা ? তোমার বর—আমায় চেন না ? আমি
বর ডি, পি, চট্টরাজ ।”

গ্যান্ডুলী ব্যারিষ্টারের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“ভূমি তবে কে ?”

“আজ্ঞে, আমি ব্যারিষ্টার ডি, পি, চট্টরাজ ।”

মাতাল অর্মানি টেঁচাইয়া উঠিল,—

“কই বাবা ঘট্‌কালী, সটকালী কেন ? আমার পরিচয়
দাও না ! আরে এ ব্যাটাও যে বলে, ডি, পি, চট্টরাজ ! আমি
চামে কাঁটা চট্টরাজ, তুই ব্যাটা কি চট্টরাজ রে ? তুই মদ
খাস্ ? ব্যাটা বে করতে এসেছ ? শশুর মশায় ! ও ব্যাটার
কথা শুনো না । আমায় বে কর, সুখে থাকবে । ছইন্ধি
যত চাও, দেব । কথা কও না যে ? কই বাবা ঘট্‌কালী ।”

আর ঘট্‌কালী ! তখন কামরার পাশে চাঁপা গাছের
উপর ব্রহ্মদৈত্যরূপে বিরাজমান । সেখান হইতে সব বেশ
দেখা যায়, শোনা যায় !

মাতাল আবার টেঁচাইয়া বলিল,—“বাবা ঘট্‌কালী, এস
বাবা । আনিরে ভবসাগরে তরী ডুবালে ! এই তোমার ধর্ম,
বাবা ঘট্‌কালী ।—আমায় এনে শশুর-সাগরে ফেলে সটকালী ?
শশুর মশায়,, তুমি বোক ! এমন কবি জামাইকে বে না ক’রে,

মালা দিচ্ছ কিনা ঐ—তুই ব্যাটা কে রে ?—স'রে পড় না ?
হইন্দি খাস্ তো আমার বাড়ী বাস্ ।—”

গ্যাঙ্গুলী ধমক দিলেন,—“চোপ্, নিকালো—দূর হও ।”

“কেন বাবা, দূর হব কেন ? মালা দাও, বাপের স্পুপুতুর
হয়ে সূড়-সূড় ক'রে চ'লে যাচ্ছি ।”

গ্যাঙ্গুলী ধরধর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁক দিলেন,
“দারোগান !”

“কেন বাবা, আবার দারোগান কেন ? দারোগান বে
আমি করব না ! ছিঃ খোটা দারোগান বে করব ! এই
বুঝি তোমার মৎলব ? বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান !—
বোঁ দেবে না বাবা ? আচ্ছা বাবা, চল্লুম । দেখে নেব—
আমি হেঁজিপেজি নই—পন্নসা আছে । দাও বাবা, আমার
হইন্দির বোতল ফিরে দাও । মনে করেছিলুম, খণ্ডর জামাই
ব'সে একটু ফুর্তি করব ! ফুর্তি করা কি বার তার কাজ !
তোমার মতন খণ্ডরকে আমি বে করতে চাইনি । তুই ঐ
খোটা দারোগানকে বে ক'রে ডাল রুটি খা—হইন্দি খাওয়া
কি বার তার কর্ম ! আচ্ছা বাবা, চল্লুম—প্রাতঃ
পেল্লাম ।”

বলিয়া, উর্-র্-র্ দাদাগো, দিদিগো—করিতে করিতে
মাতাল নিষ্ক্রান্ত হইল ।

অনেকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গ্যাঙ্গুলী
ব্যারিষ্টারকে ডিজাসা করিলেন,—“তুমি কে ?”

“আমি ব্যারিষ্টার—ডি, পি, চট্টোপাধ্যায় ।”

“তুমি ব্যারিষ্টার, আইন জানো। False personification করেছ, জানো?”

“মশাই, মাপ করবেন। আমি উদ্ভলোক, আপনার নিমন্ত্রিত অতিথি।”

“তুমি আতিথ্যের অবমাননা করেছ।”

গ্যাজুলীর স্বর অতি ধীর, কিন্তু ঈষৎ কম্পমান। শুনিলে মনে হয়, যেন অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছেন।

ব্যারিষ্টার বলিল,—“আমায় মাপ করবেন! এই পত্র আপনার লোক গিয়ে আমায় দিবেছিল। আমার নাম ডি, পি, চট্টরাজ। আপনি সিনিয়ার ব্যারিষ্টার আমি জুনিয়ার—এক ব্যবসায়ী! আমি আপনার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছি।”

গ্যাজুলী অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—

“আমি বুঝেছি—সেই Stupid Fool এই-কাণ্ড করেছে! আমিও Fool, নইলে তাকে জেনে শুনে বিশ্বাস ক’রেছিলুম!”

সেই সময় চপলা কক্ষ-মধ্যে আসিয়া গভীর স্বরে বলিল, “বাবা।”

কি তেজস্বিনী মহিমাময়ী প্রতিমা! দেখিয়া মনে হইল, ইহার ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, কমলা, রাজরাজেশ্বরী একাধারে।—“বাবা!”—গভীর চিন্তামগ্ন গ্যাজুলী চমকিত হইলেন, কিন্তু ঈষৎ বিরক্তিসূচক স্বরে বলিলেন,—

“ম্যামি, তুমি এখানে কেন?”

“আমি এখনি যাচ্ছি, বাবা! কেবল একটা কথা তোমায়

বলতে এসেছি। ইনি অতিথি, একে অপমান কোরো না, মানে মানে বিদায় দাও। এঁর কোন অপরাধ নেই।”

“সত্য।”

“আর বাবা, আমার জ্ঞান তুমি আজ অপমানিত হয়েছে, তুমি আর আমার বিবাহের কথা মনেও আনিয়ো না।”

“সে কি ম্যামি? তার সাধ্য কি আমার অপমান করে? আমি সেই অপদার্থের উপর যে রেগেছিলুম, তাই আমার অনুতাপ হচ্ছে। আমার পরম লাভ যে বিবাহের পূর্বে ওকে জানতে পেরেছি। একজন অপাত্র বলে কি আর সৎপাত্র নাই? তুই বে করবি নি কি দুঃখে?”

“দুঃখ, দুঃখ! বাবা, আমার দুঃখ তুমি বুঝবে না! আমার মা নেই, মা থাকলে বুঝতো।”

আবার সেই মুক্তার প্রস্রবণ ছুটিল।

বৃদ্ধ সিন্ধু চক্ষে দুহিতার পানে চাহিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। বলিলেন,—“ম্যামি, আমি তোমার দুঃখ বুঝব না? তুই যে আমার সব। কার মুখ চেয়ে তোমার মারের শোক ভুলছি? কার মুখ চেয়ে বেঁচে আছি? তোমার দুঃখ আমি বুঝব না! ছমাসের কুঁড়ি থেকে এই নির্মল ফুল আমি কত যত্নে ফুটিয়েছি! যখনই তোমার সামান্য অসুখ করেছে, দিন-রাত কোথা দিয়ে কেটে গেছে, জানি নি, পাপলের মতো ছুটে বেড়িয়েছি! আমি যে তোমার বাপ-মা দুই-ই! কেন আজ তুই আমার এমন শক্ত কথা বললি?”

“ক্ষমা কর বাবা, ক্ষমা কর! বড় দুঃখে তোমার মনে

ব্যথা দিয়েছি! তুমি বের কথা তুলো না, আর কখনো আমার মুখে এমন কথা শুনে না। কেন বাবা, আমি তো বলেছিলুম,—মায়ে ছেলে বেশ আছি। এর ভেতর আবার আর একজন আসে কেন?”

“আর একজন আসা প্রয়োজন, তাই আসবে। ম্যামি আমি তোমার বাপ, এমন কোনো কথা নেই, যা তুমি আমার কাছে লুকিয়েছিল! আমার তুমি সত্য ক’রে বল, এঁর সঙ্গে বে হ’লে তুমি সুখি হবি কি না।”

“বাবা, তেমনি স্বপ্ন দেখেছিলুম! কিন্তু সে রাত্রে স্বপ্ন জাগলেই ভেঙ্গে যাবে! ক্রমে তার স্মৃতিও যাবে! একটা স্বপ্নের জন্ত কৰ্ত্তব্য কেন ত্যাগ করব? আমি না দেখলে তোমায় দেখবে কে?”

“না ম্যামি, তা হবে না। কৰ্ত্তব্য কেবল তোমারই? আমার কিছু নেই? আজ বাদে কাল তোমার এই বুড়ো ছেলে তোকে ফেলে কোথায় চ’লে যাবে! তাকে আর খুঁজেও পাবিনি! তোকে চিরজীবনের জন্ত অকুলে ভাসিয়ে যাব? তোমায় সুখী করা কি আমার কৰ্ত্তব্য নয়, ম্যামি?”

“আমি অসুখী কিসে বাবা?”

“অসুখী নও, কিন্তু অসুখী হবে।”

“কেন বাবা, বললুম তো রাত্রে স্বপ্ন ঘুম ভাঙলেই ভেঙ্গে যাবে।”

“না মা, তা ভাঙে না। তুমি যখন ছ মাসের, তখন একদিন হঠাৎ আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল! কিন্তু মা, কই,

আজও তো তার ঘোর কাটেনি ! না ম্যামি, তা হয় না। স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে, ভাঙ্গে না।”

তার পর যেন আপন মনে স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন,—

“আজ আমার চোখের উপর থেকে একটা পবুদা উঠে গেছে। অর্থ আর খুঁজ্ব না—গরীব, একান্ত গরীবকে মেয়ে দেব। তাকে আমি মানুষ করব।”

একটু স্থির থাকিয়া ব্যারিষ্টারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“তোমার কি আছে ?”

সর্বনাশ ! Shaespeare ঝাড়ে বুঝি ! না—বিচ্ছেদ আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে ভায়ার কবিত্বও বোধ করি ছুটেছে !

বন্ধু বলিল,—“আজ্ঞে আমার বলতে কেবল আমিই আছি, আর উন্নতির বাসনা আছে।”

“তার জন্ম আমি দায়ী। যুবক, তোমায় অপমানের কথা বলেছি—ভুলে যাও। Forget and forgive. আমি তোমার সঙ্গে অন্তর ব্যবহার করেছি, তার দণ্ডস্বরূপ আমার এই কন্যাকে তোমায় দিলুম। আমার পুত্র নেই, বৃদ্ধ হয়েছি, তুমি যদি এসে আমার গৃহে পুত্রের স্থান আধকার কর, আমি সুখী হব। সে Fool, জীবনে অন্ততঃ একবার ঠিক ভুল করেছে। তার উপর আর আমার রাগ নেই। ম্যামি, আজ তোমার মা থাকলে কি আনন্দ !” বৃদ্ধ চক্ষু যুদিলেন।

এখন আর আমাকে প্রয়োজন কি ? আমার কার্য শেষ ! আশ্বে আশ্বে চাঁপাগাছ হইতে নামিয়া চোরের ভার চম্পট দিলাম।

তৃতীয় প্রস্তাব

“মধুরেণ সমাপয়েৎ”

আজ ব্রাহ্ম-দ্বিতীয়া। বাংলা দেশে জামাই বর্ষা প্রভৃতি
যত কিছু উৎসব অনুষ্ঠান আছে, এই ব্রাহ্মদ্বিতীয়া—সহোদরের
অর্চনা সর্বশ্রেষ্ঠ। পাঞ্জাব আবার এত প্রিয় হইলেও শুধু আজ
এই একটি দিনের জন্য আমার মন সেই প্রেম-ভক্তি করুণার
ত্রিধারায় ধৌত ভূমির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে। মনে
হয়, আমার ভাই-ভগ্নী নাই, কিন্তু সেখানে সম্বন্ধে সন্তোষ
সহোদরা আমার জন্য স্নেহের বাহু প্রসারণ করিয়া আছে। মনে
হয়, সেই স্নেহ-পাশে আপনাকে ধরা দিবার জন্য ছুটিয়া যাই!

চপলার মুখে সেই দু'দিনের জন্য 'দাদাভাই' সম্ভাষণ শুনিয়া
সহোদরা-স্নেহ কি, উপভোগ করিয়াছি।

“দাদাভাই!”

পূর্ব স্মৃতির প্রতিধ্বনির মত মধুর কণ্ঠে সেই মধুর সম্ভাষণ
সহসা আমার কানে এবং প্রাণে আসিয়া বাজিল—“দাদাভাই!”

তাড়াতাড়ি কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখি, সত্যই চপলা
উপস্থিত। বলিল,—“দাদাভাই, আজ ভাই ফোঁটা। আমি
ভাই ফোঁটা দিতে এসেছি।”

আমার চক্ষু দিয়া দুই চারিটা মোটা মোটা গোটা গোটা ফোঁটা ঝরিয়া গেল। আমি বলিলাম,—“কই দাও!”

চপলা বলিল,—“ও যা! ও কি!—আসনে বসবে চল—
তবে তো ফোঁটা দেব।”

আমি তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়া বারান্দার গিয়া দেখি একখানি আসন পাতা, আর তার সম্মুখে ভাই ফোঁটার উপ-
চার। আমি সেই আসনে গিয়া বসিলাম।

তার পর যখন সে পাবিত্রভাবে সঙ্কিত মুখে ছল-ছল নেড়ে
ফোঁটা দিতে দিতে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল—

‘ভায়ের কপালে দিলুম ফোঁটা

ষমের দোরে পড়ল কাঁটা।’

আমার সত্যই মনে হইল, আমি মৃত্যুঞ্জয় হইলাম। সেই
সময় কক্ষমধ্যে মঙ্গল শব্দ ধ্বনিত হইল। আমি বলিলাম,—

“দিদি, এইবার খাই?”

চপলা বলিল,—“ও যা! তুমি কোন্ আকালের দেশ থেকে
আসূছ, দাদাভাই?”

আকাল! স্নেহের এই পরিপূর্ণ ভাণ্ডারের দেশে আকাল!
বলিলাম,—“তুমি যে বললে দিদি, ভাই ফোঁটা দিতে এসেছি?”

দিদি হো হো-হো—সেই তেমনি হাসি—আরও মধুর, স্নেহ-
মাধা হাসি হাসিয়া বলিল,—“ফোঁটা দিতে এসেছি, বলেছি;
খেতে তো বলিনি। আগে রসো, আর একজন ফোঁটা দিক।
আমি যাই, শাঁকটা বাজাইগে।”

চপলা চলিয়া গেল। তার পর আর একটি কিশোরী ধীর-

পদবিক্ষেপে গজেন্দ্রগমনে আমার সম্মুখে আসিয়া—এ কে!—
বেলা!—সেই চঞ্চলা বেলা!—সে এমন ধীর স্থির হইয়াছে!

চপলার মত বেলাও তেমনি ভাবে তেমনি মস্ত পড়িতে
পড়িতে আমার ফোঁটা দিল। শাঁকটা বাজাইয়াই আমাদের
কাছে আসিল। আসিয়া তার সেই হাসি হাসিয়া বেলার গালে
অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—

“দাদাভাই, ইয়া আসুলি কু কি নকুলি ?”

হা-হা-হা-হা-হা—বেলা ও চপলা হাসিয়া উঠিল।

আমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলাম। বলিলাম,—“বেলা, তুমি
এখানে ?”

চপলা বলিল, “বেলা কি বিল্লী বল।”

বেলা বলিল,—“প্যারীশঙ্কর বাবুকে দেখতে এসেছি।”

এ পোড়ারমুখীদের হাত থেকে আমার রক্ষা করে কে ?

মা গেল কোথায় ? মা আজ আমায় এই দুই রাক্ষুসীর হাতে
সঁপে দিয়ে অন্তর্ধান হয়েছেন। এমন সময় বাহিরে ডাক
পড়ল,—“মুখরাজ !”

বাঁচা গেল। ঠাকুরদার গলা। আমি বাহিরে ঘাইবার
জন্ত উঠিতেছি, এমন সময় ‘মা মা’ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে
ঠাকুরদা ভিতরে আসিলেন। মা ঠাকুর-ঘর হইতে বাহির হইয়া
ঠাহাকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরদা আমাদের নিকটে আসিয়া
বলিলেন,—“সব ফোঁটা দাদাভাইকে দিয়েছিস্ ? একটা বুঝি
বুড়োর জন্তে রাখতে নাই !”

চপলা বলিল,—“তোমার ফোঁটা দেব কেন দাদামশি ? দুই

বোনে তোমার গলায় মালা দেব। তার পর দুই সতীনে তোমাকে নিয়ে খুব ঝগড়া করব।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—“দিদি, এমন দিন ছিল, যে তোদের মতন দশটা সতীনকে মুঠোর ভেতর রাখতে পারতুম!”

চপলা বলিল,—“দাদা ভাই এইবার খাও!”

বেলা বলিল,—“দাদা ভাই ও সব কি খাবে?—ও খাবে (মুহু মুহু গাহিয়া)

‘মোট মোটি ডাল রোট ছোট ছোট চানা’।”

আমি বললাম,—“বেলা দিদি, মাকে তোমার গান শোনাতে হবে।”

দুট্টা বেলা বলিল,—

“অংরেজি বোলতা হৌ, নেই বাংলা বোলতে হৌ? হামু ভি খোড়া খোড়া অংরেজি জানতা। গান মানে—কামান্।”

আবার ভেমনি হাসি। এ দুট্টাদের আঁটিয়া উঠা আমার কন্ঠ নয়। বললাম,—“তোমরা দুজনে আজ পরামর্শ ক’রে আমার জ্বালাতন করতে এসেছ?”

বেলা বলিল,—“না। তোমার দুই বৌ আর তিন লেড়কী দেখতে এসেছি। কই দেখাও, নইলে ছাড়ব না।”

দাদা মশাই বলিলেন,—“ভায়া জান তো, ছেলেবেলা তোমার মার আবদার তোমায় বলেছি—ছাড়ব না। বেলারও আবদার—ছাড়ব না। ও যখন ধরেছে, তোমার বৌ দেখবে, তখন না দেখে ছাড়বে না।”

আমি বললাম,—“তা হ’লে ঠাকুরদা, বাংলা দেশের

কুমোরের দোকান থেকে একটা আল্লাদী পুতুল কিনে আনতে হয়।”

ঠাকুরদা বলিলেন,—“কুমোরের দোকান কেন, দাদা ? আর কিনতেই বা যাব কেন ? আমি একটি সন্ধান ব’লে দিচ্ছি সেখানে গেলেই পুতুল পাবে। তবে আল্লাদী নয় ভাই—পুতুল পুতুল—নয়নপুস্তলী। মা, শোনো, আমার ছেলের একটি বাম্যবন্ধু আছে, কলিকাতায় একজন বড় চাকুরে। তার একটি মেয়ে আছে,—পরমা সুন্দরী। মা আমার বেলাকে আর চপলাকে মনে মনে এক ক’রে দেখ, তাহলেই তাকে কতকটা বুঝতে পারবে। মেয়েটি সেরানা হয়েছে।”

মা বলিলেন,—“বেশ তো বাবা, তুমি সব ঠিকঠাক ক’রে দাও।”

আমি বলিলাম,—“ঠিকঠাক কি মা ! যার বে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই !”

মা বলিলেন,—“তুই আমার কথা দিয়েছিস, জানিস !”

আমি বলিলাম,—“সে সৎপাত্র হ’লে।”

বেলা বলিল,—“তুমি সৎপাত্র নও কেমন ক’রে ? নিজের মুখেই তো বলেছ—তোমার ভালাও আছে, গৌ আছে, বিদে আছে। নৌ টান্ডা, গৌ পালতা হাঁয়—তুমি আবার সৎপাত্র নও !”

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আপনার জ্বলে আপনি বন্ধ হইয়াছি। ঠাকুরদা বলিলেন,—

“ষটকালিতে তোমার হাত খুব পেকেছে দাদা। এবার

কেমন ঘটকালি কর দেখব। শোনো, আমার বড় ধরেছে। তোমার মেয়ে পছন্দ না হয়, তুমিও খালাস, আমিও খালাস।”

মা বলিলেন,—“খালাস নয়, বাবা! খোকার বে দিয়ে তবে তোমার নিশ্চিন্ত।”

ঠাকুরদা হাসিয়া বলিলেন,—“মা, ঘটকালিতে তোমার যে রকম গুণপনা, তাতে আর আমাদের বড় কিছু করতে হবে না। ভায়া, শোনো, আমি এখন কাশীতে টেলিগ্রাম ক’রে দি. আর কলকাতায় একখানা টেলিগ্রাম ক’রে দি—মেয়ের বাপের কাছে। তুমি মেয়ে দেখে এস।”

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কাশীতে কেন, বাবা?”

ঠাকুরদা বলিলেন,—“মেয়েটি এখন কাশীতে আছে. তার দাদার কাছে। বিশ্বেশ্বরের মাথায় কেবল ফুল—বিশ্বপত্র চড়াচ্ছে, তোমার খোকারে বর কামনা ক’রে।”

আমি বলিলাম,—“ঠাকুরদা, আমার কথা সে জানলে কেমন ক’রে?”

“ভায়া, এ সব সন্ধান দেবার লোক আছে। সে কথা সেই এসে তোমায় বলবে। যাই, আমি এখন টেলিগ্রাম ক’রে দি।”

বলিয়া বেলা ও চপলাকে লইয়া ঠাকুরদা চলিয়া গেলেন।

আমি মনে মনে বুঝিলাম, আমাকে জন্ম করিবার জন্মই বেলা ও চপলা মিলিত হইয়াছে। এদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস করিতে হইবে। আমার মা আছে, দুই বোন পেয়েছি, ঠাকুর দা আছেন, বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই, আমার কি চাই! আমাকে

ভাবিতে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কবে কাশীতে যাবি বল ?”

আমি বলিলাম,—“আমি কাশী যাব না, কলিকাতায় যাব।”

মনে মনে ইচ্ছা—একটা গোলমাল হইয়া সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যায়। মা বলিলেন,—“মেয়ে রইল কাশীতে, তুই যাবি কলকাতায় ?”

“মা, বাঙ্গালীর মেয়ে বাঙ্গালায় বসে না দেখলে দেখাই হবে না!”

মা বলিলেন,—“যা ভাল বুঝিস্, কর বাপু! কাশীতে রইল মেয়ে, তুই কলকাতায় গিরে কাকে দেখবি?”

“কেন মা, আমি কলকাতায় যাচ্ছি বলে কাশীতে তার ভাইয়ের কাছে টেলিগ্রাম ক’রে দেব।”

“তবে তার বাপকেও একখানা টেলিগ্রাম করিস্।”

“তার দরকার কি ?”

“সে কি রে! তাদের কি একটা অভ্রমে ফেলবি ?”

“আচ্ছা, সে যা ভাল হয়, করুব। মা, আমি কালই যাব।”

“দিন নেই, ক্ষণ নেই, কালই যাবি কি !”

“আগে তো মেয়ে দেখে আসি মা। তার পর ফিরে এসে দিন—ক্ষণ দেখা যাবে।”

“যা ইচ্ছে কর বাপু! এবার কিন্তু বৌ ঘরে আনতে হবে, নইলে কিছুতেই ছাড়ব না।”

এই রে! মেয়েটা যেমন সেই ছেলেবেলার ঠাকুরদার

কাছে আবদার ক'রতো, আমার কাছেও তেমনি আরম্ভ ক'রেছে।

২

এই প্রকারে বাঙ্গালী মেয়েটাকে পছন্দ করিতে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। সঙ্গী—আমিই আমার সঙ্গী। এ সব কাষে সঙ্গী লওয়া সুবিধার নয়। আর সঙ্গীই বা কে আছে? স্মৃতবাৎ একাই যাত্রা করিলাম। যাত্রাকালে মা আশীর্বাদ করিলেন। কি যেন বিড়বিড় করিয়া ঠোঁট নাড়িয়া বলিলেন। বোধ হয়, প্রজাপতি ঠাকুরের কাছে কচি পঁঠা মানত করিলেন। পরে বলিলেন,—

“কালীঘাটে যাকে দর্শন করিস্। আসবার সময় কিছু প্রসাদ নিয়ে আসবি। গিয়েই টেলিগ্রাম করবি। দেখিস্ কোন গোলমাল করিস্ নি। এই পাঞ্জাবী পোষাক প'রে বুঝি তাদের বাড়ী যাবী! বল্লম শুন্লি না, ধুতিচাদর পর। তা'না, ছাতুর পোষাক। যা' হয় কর্ বাপু। ট্রেন হ'তে নামবার সময়ই পোষাক বদলাস, বুঝলি?”

“বুঝেছি, এর মধ্যে না বোক'বার কিছুই নেই। আর সময় নেই।”

মার পদধূলি মাথায় লইয়া যাত্রা করিলাম। যতদূর দেখা যায়, মা জানালায় দাঁড়িয়ে আমার দেখিতে লাগিলেন—ছেলে দিগ্বিজয়ে ঘাইতেছে! এ আনন্দের মধ্যেও যেন একটু বিবাদের কালিমা! নয়নমণি নয়নাস্তুরাল হইলে, মা বোধ হয়, অশ্রু মুছিয়া জানালা বন্ধ করিলেন। কঠিন ডালকটির প্রাণ আমার চক্ষেও

জল আসিল! প্রাণটা কেমন ওলুটি-পালুটি করিতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, না, কাষ নেই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই—মায়ের কোলে ফিরিয়া যাই। কিন্তু তখন আর ফিরিবার সময় নাই। যা থাকে কপালে,—রণক্ষেত্রে কাঁপ দিলাম।

কাঁ করিয়া একখানা সেক্বেণ্ড-ক্লাসের টিকিট কিনিয়া একেবারে প্লাটফর্মে আসিয়া গৌফে এক তা দিয়া দাঁড়াইলাম। এতগুলো টাকার মায়্যা গৌফে তাঁর সারিবে কেন? অত্যাশ, অত্যাশ,—ইন্টার-ক্লাসের একখানা কিনিলেই ত হইত! হঠকারিতায় কি আহাশ্বকিই করিলাম। প্রাণটা দমিয়া গেল। কিন্তু কেন যেন দমা-প্রাণটার আমার অজ্ঞাতসারে কি যেন একটা সুখের কাঁপুনি ফুকানিয়া উঠিতেছিল। হউক না ভাবী—তবু ত শশুরবাড়া বটে। এই যা ভরসা। ভাবীতেই এত সুখ! আহা, বর্তমানে না জানি সে কেমন! মধুর কল্পনায় প্রাণটা আবার তাজা হইয়া উঠিল। ব্যাগটা খুলিয়া এক পোঁচ গোলাপী খোসুবাই-আতর গৌফে মাখিয়া লইলাম। স্ফূর্তির হিড়িকে একটু বেশী আতর গৌফে লাগিয়া গেল। আর যায় কোথায়,—একেবারে ধূম্রহীন দাবানল! বিষম জ্বলনি আরম্ভ হইল। জ্বিত দিয়া খানিকক্ষণ ঠোটখানা চাটলাম। জ্বিটা তেতো হইয়া গেল! এমন সময় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। হাত-বিছানা ও ব্যাগটা বগলে ও হাতে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। উঠিতে গিয়া পাগড়ীটা জানালার মাথায় লাগিয়া পড়িয়া গেল। হায়, কি কুক্ষণেই যাত্রা করিয়াছি! কে জানে, লমাটে আরও কত কি আছে!

শূণ্য কামরা , আমিই একমাত্র আরোহী । যাহা হউক, পয়সার সুখ হইল । গাড়ী ছাড়িয়া দিল । আহা, কি মধুর বাশরীর সুর ।—“ইষ্টাশন কদম্বমূলে গাড়ী বঁধু বাজার বাশী ।”

ষৌবনকাল, তাতে আবার কার্য্যকারণের যোগাযোগ । সে সুরে কত কথাই মনে হইতে লাগিল । পা ছড়াইয়া চক্ষু যুদ্ধিত করিলাম । কত কি দেখিলাম, কত কি ভাবিলাম ! বার শত মাইল এখনও বাকী !—বাকালী মেয়েটা যদি কালো হয়—ঠোট ছুটো যদি লাল না হয়—এমনি রসের নাগরদোলায় ডিগ্বাজি খাইতে খাইতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে অতি বেগে চলিলাম ।

৩

তালগাছের আড়াই হাত । আর চারিশত মাইল মাত্র বাকী । কিন্তু এই চারিশত মাইল আমার কাছে একটা দীর্ঘ-জীবনের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ।

ক্রমে গাড়ী বিখ্যাত যোগলগরাই স্টেশন আসিয়া হাঁপ ছাড়িল । আর একটু বাকিলেই ঈশ্বর কানী দর্শন হয়, কিন্তু বেটার অদৃষ্টে তা নাই । দূর হইতেই কানীনাথের উদ্দেশে নমস্কার করিলাম । তার পর কিছু জলযোগ করিয়া শরীর মন শীতল করিলাম ।

গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব নাই, এমন সময় দুইটি বাকালী-মহিলা, একটি ছিপ্‌ছিপে, সোনার-চশমাপরিহিত যুবককে সঙ্গে করিয়া আমার শূণ্য গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন । ছুটাছুটি, হেঁচ, বাস্ক ব্যাগ দমাদম—একটা বিরাট কাণ্ড করিয়া কোন

রূপে গুছাইয়া বলিলেন। বসিতে না বসিতেই অল্পবয়স্ক মহিলাটি অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—

“সৰ্কনাশ হয়েছে! বৌদি! খাবারের চাকারী! মেজদা খাবারের চাকারীটা দেখছি না যে, ওয়েটিং-রুমে পড়ে আছে বুঝি? যে তাড়াতাড়ি করে।”

“তাইতো।”

বলিয়া তাহার মেজদা নামিয়া পড়িলেন। মেয়েটি উদ্বিগ্ন হইয়া মেজদাকে ডাকিলেন,—“এস কাজ নেই, গাড়ী এখনি ছেড়ে দেবে। যেয়ো না, খাবারে কাজ নেই—”

“নিয়ে আসছি।” বলিয়াই সেই মেজদা দ্রুতগতিতে ওয়েটিং-রুমের অভিমুখে ছুটিলেন।

“কি হবে, বৌদি? গাড়ী যদি ছেড়ে দেয়, কি হবে! কেন আমি ছাই খাবারের চাকারীর কথা বললুম! এস, আমরা নেমে পড়ি।”

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই আমার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। আমি গম্ভীর হইয়া পাহুটো তুলিয়া পাঞ্জাবী টংএ বসিয়া টাইম টেবেলখানার পাতা উন্টাইতে লাগিলাম,—এমন উদাসীন ভাব, যেন আমি তাদের কথাবার্তা, কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। মেয়েটা আমার তদবস্থ দেখিয়া একটু বোধ হয়. আশ্চর্য হইল—বেটা হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী নয়, ওর কাছে আর ভদ্রতা অভদ্রতা লজ্জা-সঙ্কোচ কিসের?

বৌদি জানালার মুখ বাড়াইয়া মেজদার আগমন-প্রতীকার সোৎসাহে প্লাটফর্মের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে

গাড়ী নড়িয়া উঠিল। নড়িয়াই গতি বিশিষ্ট হইল। কিন্তু মেজদা কৈ ? মেয়ে দু'টি আকুলি-বিকুলি চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন ; গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে, নামিবার সাধ্য নাই। আমিও জানালায় মুখ বাড়াইয়া দিলাম।—ঐ যে, ঐ যে,—খাবারের চাকারী হাতে মেজদা ছুটিয়া আসিতেছেন। আর একটু, আর একটু—গাড়ী সাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল। মেজদা প্লাটফর্মে পড়িয়া রহিলেন। চাহিয়া দেখিলাম, খাবারের চাকারী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মাথায় হাত দিয়া, মেজদা বসিয়া পড়িয়াছেন। তার পর আর দেখা গেল না। একমেষ কাল ধোঁয়া আসিয়া আমাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মেজদাকে আমাদের দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত করিল।

মহিলা দু'টি হায় হায় করিয়া আকুলি-বিকুলি কাদিতে লাগিলেন। কি করিব, গন্তীর হইয়া সব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মনে মনে ভারী ব্যাধিত হইলাম। আমার মুখের দিকে তাঁহারা ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি কি করুণ, কি মর্মান্বশী ! জীবনে এমন আর দেখি নাই, দেখিতে যেন না হয়। সে কাতর দৃষ্টির প্রশ্ন—আমি কোন সাহায্য করিতে পারি কি না। পারি, খুব পারি ! বেদনার সঙ্গে আনন্দের একটা সূক্ষ্ম সুরে আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, হৃদয়টা কি ভয়ানক ! কারো সুখ, কারো দুঃখ। মনে মনে বলিলাম, আমি আছি, তোমাদের কোন ভয় নাই। কিন্তু বলিলে কি হইবে, দুঃখে যে সুখ অনুভব করে, তাকেই তো ভয় ! আমিই তাঁদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ হইলাম।

আমাকে নিৰ্ভীকর, নিশ্চেষ্টে থাকিতে দেখিয়া তাঁহারা আরও ভড়কিয়া গেলেন। ভাবিলাম, আর নয়, আর একটু বিলম্ব হইলে তাঁহারা শিকল টানিবেন! তখন আমি যে ভালমানুষ, কিছুতেই প্রমাণ হইবে না। আমার এই ছদ্মবেশই অপরাধের প্রধান সাক্ষী হইবে—আমিই আমার বিভীষণ হইব। মনে মনে বলিলাম, “ওগো, আমি তোমাদের জন্য এ বিপদে জীবন-পর্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত।”

কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অন্তরের ভাষা মাতৃ-ভাষাই বাহির হয়, স্মরণে কিছুতেই বলিতে পারিলাম না। এই পোষাকে এতক্ষণ পরে বাংলা বলিলে, হিতে বিপরীতই হইবে। কি করি, যা থাকে কপালে, হিন্দিতেই আরম্ভ করি। কি জানি, তাঁরা আমার মনের কথা বুঝিলেন কি না বোধ হয় কিছু বুঝিয়াছিলেন, কেননা, এসম্মুখে তাঁরা বিলক্ষণই পটু।

ভগবান্ রক্ষা করিলেন! প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা পাইলাম। তাঁরাই প্রথম মুখ খুলিলেন। কনিষ্ঠা মহিলাটি—কিশোরী, কি সুবতী, কি মাঝামাঝি;—না কিশোরীই, কেননা, কুমারী—আমায় সম্বোধন করিয়া পরিষ্কার হিন্দিতে বলিলেন,—

“জী, আমরা বড় বিপদে পড়েছি। দয়া করে যদি একটু উপকার করেন! আমরা বড়ই অসহায়, বিপদগ্রস্ত।”

আমি চোখ খুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। হিন্দিতেই উত্তর দিলাম,—

“আমি আপনাদের এই বিপদে বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, আপনারা নিশ্চিত হউন। আমি প্রাণপণে আপনাদের

সাহায্য করব। আমি যতক্ষণ আপনাদের সঙ্গী থাকব, ততক্ষণ আপনাদের কোন ভয় নাই, জানবেন।”

মহিলা দুটির ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাঁরা যেন আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন—একটা শান্তিসূচক খাটো নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, যেন কহুকটা প্রকৃতি হইলেন।

কিশোরী সাগ্রহে বলিলেন,—“আপনি কোথায় নাব্বেন?”

“আমি কলিকাতায় যাইতেছি।”

“আমরাও কলিকাতায় যাইব। তবে ত আপনি বরাবরই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।”

“আজ্ঞে হাঁ, আমি আর কোথাও নাব্ব না।”

বালিকার মত সরল-ব্যাকুলভাবে গদগদ হইয়া তিনি আবার বলিলেন,—

“না, কোথাও নাব্বেন না। আমরা বড় অসহায়, বড় বিপদে পড়েছি, আমাদের আপনি ছেড়ে যাবেন না।”

“আপনারা কিছু ভাববেন না। আমি থাকতে কোন ভয় নাই। আপনারা বড় ভয় পেয়েছেন। একটু শান্ত হ’ন। আমি সব ঠিক ক’রে দিচ্ছি। আপনারা যার সঙ্গে আসছেন, তাঁর নামটা কি?”

“তিনি আমার মেজদাদা, তাঁর নাম সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।”

“পরের দৃষ্টানেই তাঁর নামে তার করব। বোধ হয়, আমরাও তাঁর তার পাব।—হাঁ, আপনারা কোথেকে আসছেন?”

“কাশী থেকে।”

কাশীর নাম শুনে মনে যেন কেমন একটু ফুঁটি বোধ হইল। স্মরণে কাশীর প্রসঙ্গটাও আর না চালাইয়া থাকিতে পারিলাম না! বলিলাম,—“আপনারা তা হ’লে কাশীতে থাকেন?”

“কাশীতে আমাদের বাড়ী আছে। পূজোর সময় মা বাবা সকলেই কাশীতে বেড়াতে এসেছিলেন; সম্প্রতি তাঁরা কলিকাতায় ফিরে গেছেন। কলিকাতায় আমাদের আসল বাড়ী; কাশীতে আমি, আর ইনি—আমার বৌদিদি, বড়দাদা এবং মেজদাদা থাকি। বড়দাদা বাবার সঙ্গেই কলিকাতায় গেছেন।”

“আপনারা কি এখন তবে কলিকাতায়ই থাকবেন? আর কাশী আসবেন না?”

“আসব বই কি, তবে কবে আসব, ঠিক নেই।”

আমার জেরায় অল্প সময় হয় তো ইহারা চটিয়া আগুন হইতেন। কিন্তু স্থানকালপাত্র তাহা হইতে দিল না। বরং দেখিলাম, আমার এই আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নে তাঁহারা যেন খুসাই হইয়াছেন! ইহাতে আমার স্বার্থ ছাড়া অল্প একটা উদ্বেগও ছিল, তাঁদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা করিয়া লওয়া, এবং কথায় কথায় তাঁদের অন্তমনস্ক রাখা।

“আপনারা যে কলিকাতায় যাচ্ছেন, আপনার বাবা কি তা জানেন?”

“জানেন বই কি, তিনিই তো আমাদের যেতে টেলিগ্রাম করেছেন।”

“আপনারা এই ট্রেণেই যাচ্ছেন, তা কি তিনি জানেন?”

কিশোরী যেন জিজ্ঞাসু হইয়া অর্ধ-অবগুণ্ঠিতার দিকে চাহি-

লেন । বলিলেন,—“বৌদি, মেজদা নিশ্চয়ই বাবাকে টেলিগ্রাম করেছেন, না ? তুমি জান কি ?”

বৌদি’ একটু ভাবিয়া বলিলেন,—“না ভাই, আমি তো তা’ জানি নে ।”

কিশোরী তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“না জী, তা আমরা ঠিক জানি না । আপনি দয়া ক’রে বাবার কাছেও একটা তার ক’রে দেবেন ।”

“নিশ্চয়ই দেব, দেব ব’লেই ও কথা জানতে চেয়েছিলুম ।”

“আপনার দয়া আমরা জীবনে ভুলব না ।”

আমি একটু গ্যাকামি-ধরণে বলিলাম,—“না, না, সে কি বলছেন ? এ আর দয়া কি ! আপনার বাবার নামটি কি বলুন তো ?”

পিতার নাম শুনিয়া আমি একেবারে হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম । এ কি শুনি ! এ যে আমার ভাবী স্বশুরমহাশয়ের নাম । কাশী, কালকাতা, স্বশুরেব নামে নাম—তবে কি ?—আমার বুকটা ছুঁকছুঁক করিয়া উঠিল ; মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে কি যেন একটা বেরিয়ে গেল । জানি না, সে বাঙ্গালা না হিন্দী । আমি মরমে মরিয়া গেলাম ।

হঠাৎ কিশোরী আমার মুখের দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াই বলিলেন,—

“আপনি কি বাবাকে চেনেন ?”

টোক গিলিয়া কোনমতে বলিলাম, “না, তাঁকে দেখি নাই, তবে তাঁর নাম শুনেছি । জানি না, তিনি কি না । আচ্ছা,

তিনি কি কিছুদিন আগে একবার লাহোরে বেড়াতে গিয়েছিলেন ?”

“লাহোরে ? হাঁ, তিনি কিছুদিন হ’ল লাহোরে গিয়েছিলেন । আপনি কি ক’রে জানলেন ?”

মুস্কিলে পড়িলাম । তিনি না বলিলেই চুকিয়া যাইত । এখন যদি ধরা পড়ি ! তার পড়িলামই বা, ক্ষতি কি ?—না—তা হবে না । আনন্দে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, আমার আর সন্দেহ হইল না—ইনিই আমার ‘তিনি’ হইবেন ? তাই যদি হয়, তা’হলে এমন সুন্দর, এমন সরল,—আমি বড় ভাগ্যবান । ঠাকুরদা কহি বলিয়াছেন !

আমার নিকটর দেখিয়া তিনি আবার খাললেন, “কেমন, চিনেছেন কি ?”

“হ্যাঁ চিনেছি ।”

আমার কথায় তাঁর মুখে একটা আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল । আমি সে সুন্দর মুখের সে সুন্দর ভাবটুকু উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ; অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম । আর কিছুই মনে রহিল না । আমি যাহাকে দেখিতে যাঁতেছি, এমন করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইব—এমন সুন্দর নিঃসঙ্কোচ ভাবে !

সব ভুলিলাম, ইচ্ছা হইল, তার সুন্দর, শুভ্র নিটোল, কামল হাতখানি ধরে বলি,—‘আমি তোমাকেই দেখতে যাচ্ছিলুম তোমাকে দেখতে পেয়েছি ।’

মনের কথা মনেই রইল, বলা হইল না । বলিলাম না যে,

ভালই করিলাম। বলিলে হয় তো একটা বিষম কাণ্ড ঘটয়া যাহত! হয় তো তাহারা আমায় জোছোর ঠাণ্ডরাইয়াই বসিতেন। বৌদি' শিকল টানিয়া আমার শিকল পরার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তবে এমন উদ্ভ্রাসটা একেবারে মাটি হঠতে দিলাম না! অতঃপরে তাহাকে রাখিয়া সাহায্য প্রচার করিতে বসিয়া গেলাম। বলিলাম,—

“আপনারা তবে আমার আত্মীয়। আপনারাও আমায় আত্মীয় ভাববেন, পর ভাববেন না।”

এতক্ষণে বৌদির মুখে কথা ফুটিল। একটু করুণ অথচ স্মিতহাস্তে ভাঙ্গাভাঙ্গা হিন্দাতে বলিলেন,—

“আপনিও আমাদের পর ভাববেন না। ভাগ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল; নইলে—ইত্যাদি।”

অতঃপর উভয়পক্ষ কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। গত বিপদ গত হইল, শুধু ভবিষ্যতের জন্ত একটা স্মৃতি রাখিয়া সরিয়া পড়িল। এমান সময়েই গাড়ী বক্সার ষ্টেশনে আসিয়া হাঁপ ছড়িল। আমার নবীনা বন্ধুটি বলিলেন,—

“তবে আপান এবার টেলিগ্রাম করে আসুন,—হুইথানা। একখানা কলকাতায়, আর একখানা—মেজদার কাছে, মোগল-সরাই। আহা, মেজদা কত না ভাব্চেন, হার হার কর্ছেন!”

বৌদিদির দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

“আমায় কাছে তো টাকা নেই,তোমার কাছে আছে কি?”

টাকার প্রশ্ন উঠিতে না উঠিতেই আমি সটান নামিয়া ষ্টেশন ঘরে ঢুকিলাম। মোগলসরাই ষ্টেশনে আমার ভাবী

বধূর-কুটুম্বের নামে তার করিলাম।—‘তুমি পরের গাড়ীতে চলে এস, কোন ভয় নাই। গাড়ীতে আমাদের একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি সব ঠিকঠাক করে দেবেন। আমরা তাঁর সঙ্গে কলিকাতা চলিলাম।’

কলিকাতায় তার করিলাম না। এখন আমিই কর্তা। তাঁদের আর উদ্বিগ্ন করিতে ইচ্ছা হইল না।

ঘণ্টা পড়িল। আমি দৌড়িয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। আমার বন্ধু গাড়ীতে দরজার কাছে বুকিয়া পড়িয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কোন দিকে খেয়াল নাই। একটা আধা-সাহেব শিষ দিতে দিতে পায়চারী করিতেছিল, আমায় গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

একটু হাঁপ ছাড়িয়া বসিলাম। বন্ধু বলিলেন,—

“আপনাকে কত কষ্ট দিলাম! আপনি ঠিক বলেছিলেন, এই দেখুন মেজদা তার করেছেন। আপনি যখন টেলিগ্রাম করতে যান, তখন ষ্টেশনের এক পিওন এসে দিয়ে গেল। আমার নাম ধরে ডাকছিল শুনে আমি চম্কে উঠেছিলুম। তারপর দেখি টেলিগ্রাম, এই দেখুন।”

এই বলিয়া টেলিগ্রামখানা আমার হাতে দিতে আসিলেন। আমি বলিলাম,—“আপনিই পড়ুন না।” বলিতেই বন্ধু একটু স্মিতহাস্তে সলজ্জকণ্ঠে পাঠ করিলেন। একে দো ইংরেজী, তাতে আবার টেলিগ্রাম। বুঝিলাম আমার বন্ধু কালে আমাকেও ইংরেজী বিদ্যায় ছাড়াইয়া যাইবেন। একটা সসম্মানে, আত্মগৌরবে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। আমাদের দাম্পত্য-

লীলার বুদ্ধিরও একটা অঙ্ক থাকিবে। বন্ধুকে বলিলাম,—

“আপনি কি কলেজে পড়েন ?”

“না, অতদূর যেতে পারি নি. স্কুলের পড়া শেষ করেছি মাত্র।”

“আর পড়বেন না ?”

“না, আর পড়া হবে না।”

“কেন ?”

বন্ধু মুখ লাল করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। বো-
দিদি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

কেন হবে না, সে কথা আমি পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম ! দু’দিন
পরেই বিবাহ—আর পুঁথি পড়ার অবসর ও সুবিধা কোথায় ?
এখন অল্প পড়া—বোঝাপড়া।

বন্ধু বলিলেন,—“মেজদাকে পরের গাড়ীতে আসতে বলে-
ছেন তো ?”

“হঁ। তিনি পরের গাড়ীতেই আসবেন। হঁ, আপনার বাবাকে
আর তার করি নি। আপনারা যাচ্ছেন—জানেন। কিন্তু এ
বিপদের কথা শুনে, তিনি ভারী উদ্ভিগ্ন হ’য়ে পড়বেন।”

বন্ধু একটু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—

“না, তার না করলে আরও উদ্ভিগ্ন হবেন।”

“কি করে ? আপনাদের এই ঘটনার কথা কি ক’রে
জানবেন ?”

“মেজদা এতক্ষণে জানিয়েছেন।”

শেষে বোকা বনিয়া গেলাম একটি বালিকার কাছে ! কর্তৃত্ব.

করিতে গিয়া কি আহম্মাকি করিলাম। মনে মনে, নাকে-কানে ধত্ দিলাম, এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, ভবিষ্যতে আর কখন এমন কর্তৃত্ব করিব না।

কুণ্ঠিতস্বরে বলিলাম,—“তাই তো, ও কথা আমি বুঝতে পারি নাই। এই দেখুন, বাঙ্গালীতে আর পাঞ্জাবীতে কত প্রভেদ। আজ আপনার কাছে একটা কিছু শিক্ষা করুন।”

বৌদি’ যেন স্বগতঃ বলিলেন,—“পুরুষমাত্রেই এমন বোকা, সে বাঙ্গালীই কি, আর পাঞ্জাবীই কি। পাঞ্জাবীরা সেটা স্বীকার করে, কিন্তু বেহারা বাঙ্গালী-পুরুষগুলো সেটা স্বীকার করা দূরে থাকুক, উণ্টো নির্বুদ্ধিতাকে ধম্কে ঢাকতে চায়।”

বৌদি’র বাঙ্গালী-বিদ্বেষটা আমার মন্দ লাগিল না। অবশ্য এ ইতিহাসের মূলে একটা মধুর কলহ বর্তমান! যা’ হোক, আমি আরও একটু গাফালা সাজিয়া বৌদিকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম—
আমাকে কিছু বলেছেন নাকি?”

বৌদি’ যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “না—না—আমি বলছিলাম। টেলিগ্রাম নাই বা করলেন।”

স্ত্রী-চরিত্র বুঝা ভার। বলিলাম,—

“তা হয় না, আমি পরের ষ্টেশনেই টেলিগ্রাম করব।”

বন্ধু একটু হুঃখিত হইয়াই যেন বলিলেন—

“দেখুন, আমাদের কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই, আপনি—”

বাধা দিয়া আমি বলিলাম,—

“বেশ তো, না হয় আমার কাছে এর জন্ত ঋণীই রইলেন। আমি আপনাদের আত্মীয়, আমার উপর এখন আপনাদের

সম্পূর্ণ ভার, সুতরাং আপনাদের কোন ওজর আপত্তি আমি শুনছি না, কোনরূপ সঙ্কোচ আমি গ্রাহ্য করুব না।”

বন্ধু হাসিলেন। বলিলেন “ক্ষমা করুন, আমি আর কিছু বলুব না।”

বৌদি’ কিন্তু ছাড়িলেন না। বন্ধুর চেয়ে বয়সও বেশী, সংসারটা দেখাশুনাও কতকটা হইয়াছে। সুতরাং অমন এক কথায় তুচ্ছ করিবার ও তুচ্ছ হইবার মত মন এখন তাহার নাহ। বলিলেন— “আপনি আমাদের অসময়ের বন্ধু, আপনার এ দয়া জীবনে ভুলব না।—আত্মীয়? আপনি আত্মীয়ের চেয়েও বেশী।”

বন্ধুর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কি যেন বলিতে তাঁর হৃদয় চাহিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না। আমি তাঁকে দেখিতেছিলাম। আমারও চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিল। বন্ধু আমার মুখে সরল, শান্তদৃষ্টি স্থাপন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,— “আপনি পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ছিলেন, নইলে ভগবান এ বিপদে আপনাকে আমাদের কাছে পাঠাবেন কেন?”

আমি নয়ন নত করিলাম, মনে মনে আনন্দের হাসি হাসিলাম। মনে মনেই বলিলাম—হাঁ ছিলাম বই কি, খুবই ছিলাম। পূর্বজন্মে যা ছিলাম, এবারও তাই হতে এসেছি। প্রকাণ্ডে বলিলাম,—

“আমারও তাই মনে হয়। আপনাদের দেখেই যেন মনে হ’ল যেন কবে দেখেছি, কোথায় দেখেছি যেন আপনারা আমার কত কালের, কত দিনের আত্মীয়!”

বৌদি’ বলিলেন,—

“আমাদের তা হ’লে মনে রাখবেন, ভুলে যাবেন না।”

বন্ধু বলিলেন,—“হাঁ, আমাদের ভুলবেন না, মনে রাখবেন।”

“আশা করি, আপনারাও আমায় ভুলবেন না।”

বন্ধু একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—

“আপনি যে বাঙ্গালী নন, সে কথা আমাদের মোটেই মনে ছিল না। আপনি যেন আমাদেরই একজন। তাই ত, আপনি যদি বাঙ্গালী হতেন!”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—“যদি হ’তেন, তবে কি হ’ত?”

বৌদি’ অশ্রুদিকে মুখ করিয়া হুষ্ঠামির হাসি হাসিয়া বন্ধুর আঁচলে একটি স্মৃষ্ণ টান কসিয়া বাংলায় বলিলেন,—

“বাঙ্গালী হলে আমাদের এই আদরণীকে দান কর্তাম।”

বন্ধু লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—

“যাও! উনি যদি বাঙ্গালা বোঝেন?”

“বুঝলেনই বা, বেশ তো! পাঞ্জাবী আর বাঙ্গালী—বেশ মানাবে।”

সর্বনাশ! আবার সেই Intermarriage আসে যে!

“বৌদি, তুমি বড় অসত্য। যাও, চুপ কর, ছিঃ!”

আমি যেন কিছুই বুঝিতে পারি নাই--এমনি ভাল মানুষটির মত গম্ভীর হইয়া রুমালে মুখ-দাড়ি মুছিতে লাগিলাম। অবশ্য, এই মোছার একটা উদ্দেশ্য ছিল। অধরের হুষ্ঠহাসি কি জানি যদি দাড়ি ভেদ করিয়া প্রকাশ পায়! সাবধানের মা’র নাই। মনে মনে দাড়িকে ধন্যবাদ করিলাম। বৌদি’ আমায় নিতান্ত উদাসীন দেখিয়া বন্ধুর অমূলক সন্দেহে

মোটেই বিশ্বাস করিলেন না। চাপা হাসি আরও চাপিয়া বলিলেন,—“কেন, দাড়িকে তোর এত ভয় কেন? পাঞ্জাবীরা তো এমনিই দাড়ি রাখে। তোর যদি ভাল না লাগে, বিয়ের পর নাপিত ডেকে ফেলে দিবি। কিন্তু যা বল তাই, আমার কিন্তু ঔঁকে পাঞ্জাবী বলে মোটেই মনে হয় না। দেখছ না, কেমন ফুটফুটে রং, লম্বা ছিপছিপে চেহারা,—দাড়িটা খেন আটা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে। কে জানে, পাঞ্জাবী না আর কিছু!”

শুনিয়া আমার গা জ্বলিয়া গেল। আমি যেতো বাঙ্গালী! অকুত্তজ,—এই তোমাদের ব্যবহার! আমাকে সন্দেহ! আচ্ছা দাঁড়াও, এর প্রতিশোধ লইতেছি। স্বীলোকের বিবাহ হইলে, অচিরেই এক একটা গোলোক ধাঁধা হইয়া দাঁড়ায়, কোন বিষয়ই বিশ্বাস করিতে রাজি হয় না।

কিন্তু যাই বলি, মনটা একটু দমিয়া গেল। বন্ধু বলিলেন,—

“ওদের ওতেই সুন্দর দেখায়।”

“বটে, এইবার ষট্‌কালিটা কার! যাক্ ঔঁর পরিচয়টা আমাদের জানা দরকার, উনি আমাদের এত করলেন।”

“না, আমি পারব না, তুমি জিজ্ঞাসা কর।”

“কেন, লজ্জা কিসের, এ তো আমাদের কর্তব্য। বাবা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তখন ও কিছুই বলতে পারব না। আর একটা কথা, উনি পাঞ্জাবী, অবশ্য লাহোরের সংবাদ রাখেন। কি বলিস্, হেম?”

“যাও।”

হেম কৃত্রিম কটাক্ষে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিল। বৌদি' সুবিধা পাইলেন ; বলিলেন,—“হয় তো আমাদের বন্ধুটির কোন খবরও জানতে পারেন।”

হেম রাগিয়া বলিলেন,—“আর বন্ধুতে কাষ নেই!”

“কেন, একজন পেয়েছিস্ বুদ্ধি?”

“দেখ বৌদি—”

“আমি তো তাই দেখ্ছি!”

“তুমি বড় বেহায়া মেয়ে—তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি পারুব না।”

“তবে এত রাগ কেন?”

বলিয়া বৌদি আমার দিকে ফিরিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। হেমের পিতার নামে তার করিলাম,—“কাল ভোরে হাওড়ায় পৌছিব, আমরা গাড়ীতে বেশ নির্বিঘ্নে আস্ছি।”

আবার গাড়ী চলিতে লাগিল। আর অধিক আলাপ করিতে সাহস হইল না। বিশেষতঃ যে প্রসঙ্গটা ইতঃপূর্বেই উত্থাপনের প্রস্তাব চলিয়াছিল, সেটা আমার নিতান্ত রুচিকর হইলেও, বাধ্য হইয়া তাহার হাত এড়াইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম,—ব্যাগ হইতে একখানা ইংরেজি বই বাহির করিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলাম।

আমায় ঐরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহারা একটু দমিয়া গেলেন। আর সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ততটা সাহস করিলেন না। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া চলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গাড়ীতে আলো জ্বলিল। তখন বই বন্ধ করিয়া একবার বাহিরের সন্ধ্যা প্রকৃতির শোভা দর্শনে মনোনিবেশ করিলাম। অন্তরের পরিপূর্ণতার সমস্ত প্রকৃতি পরিপূর্ণ দেখিলাম। ভিতরে বাহিরে আজ আমার আনন্দের উৎসব। আমার সঙ্গিনীদ্বয়ও আমারই মত চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া সন্ধ্যা প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতেছিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার হইল। অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছিল। দিনের সুরের সঙ্গে রাত্রির সুর—কেমন যেন বেসুরা বাজিতে লাগিল। মনটা কেমন যেন অজ্ঞাত একটা বেদনায় ছট্‌ফট করিয়া উঠিল! হেমের মুখের দিকে চাহিলাম। এতক্ষণ চাহি নাই, চাহিয়া দেখি নাই, তাই বুঝি এত ছট্‌ফটানি। হৃৎকের ঔষধ চিনিয়া লইলাম। আমি চাহিতেই হেমও আমার দিকে চাহিলেন। সন্ধ্যাচটা প্রকাশ না হয়ে পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি বলিলাম,—“এইবার কিছু খাবারের যোগাড় দেখি, কি বলেন?”

“তাই তো, আপনার বড় ক্ষিদে পেয়েছে!”

“শুধু আমার কেন, আপনাদেরও কি পেতে নাই? তা, সত্যি, আমার ক্ষিদে কিছু পেয়েছে বহু কি।”

বোর্দি' ব্যথিতকণ্ঠে বলিলেন,—“পরের ষ্টেশন হইতে কিছু খাবার লওয়া যাবে!”

বলিয়াই বোর্দি' বেতের একটা বাক্স খুলিয়া কয়েকখানা আশ্বাণ-সিলভারের বাসন ও দুই তিনটা গ্লাস বাহির করিলেন।

হেম জলের কঁজো হইতে জল ঢালিয়া বাসনগুলি ধুইয়া লইলেন ।
পরবর্তী ষ্টেশনের অপেক্ষায় সোৎসুক হইয়া রহিলাম ।

ষ্টেশন হইতে কিছু ফল রুটি ও মিষ্টি কিনিয়া আনিলাম ।
পর্যাপ্ত পরিমাণেই কিনিলাম । আমার এই নূতন-জীবনে
গৃহের আভাস-প্রাপ্ত হইলাম ।

হেম আমার হাত হইতে সব গ্রহণ করিলেন এবং
বলিলেন,—“আপনি বাসিয়া যান ।”

হেম বৌদি’র সহযোগে পেট পূর্ণ করিয়া আমাকে রুটি
দিলেন, আমি টপাটপ্ ছ’খানি সাবাড় করিলাম । অতঃপর
আর একখানা । ভাবিলাম আর না, আর খাইলে আমাকে
নিশ্চয় এরা অসত্য ভাববে । সুতরাং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও
বলিতে হইল—“না, আর না, সব খেলে আপনারা কি
খাবেন ?”

হেম হাসিয়া ফেলিল, বলিল, “না—না, সে কি, এই
মিষ্টিটা নিন ।” বলিয়াই আমার হাতের উপর ধীরে ধীরে
দিল । দিয়াই আবার বলিল,—“আর একটা ?”

“আর খেলে মরে যাব ।”

মনে মনে বলিলাম, মিষ্টি দেবার জন্য এত তাড়াতাড়ি
কেন ? ভবিষ্যতে তো দীর্ঘ জীবন পড়িয়া রহিয়াছে । কত
মিষ্টি দিতে পার, বুঝ্ ব ।

হেম, বলিল, “মিষ্টি খাওয়া বুঝি আপনাদের পাঞ্জাবীদের
অভ্যাস নেই ?”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—

“বান্ধালীরা খুব মিষ্টি খায়।” হঠাৎ বৌদি বলিলেন,—
 “আপনিও ত বান্ধালী।” বলিয়াই কথাটা সারিয়া লইলেন,
 যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছেন।”

আমরা সকলেই হাসিলাম।

জলযোগান্তে লম্বা হইয়া পড়িলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।
 মনে হইল, যেন আমি আজ বাসরে শুইয়া আছি। কিন্তু
 তখনই গাড়ী বংশধ্বনি করিল। বুঝিলাম, এ বাসর নয়, চলন্ত
 ট্রেনেই শুইয়া আছি। হউক ট্রেন, এ ট্রেনেই আমার বাসর,—
 বাসরের চেয়েও বেশী। হেমকে এখন মা পছন্দ করিলে হয়—
 আমি কি বোকা! মাকে মা বলিলেই তো তাঁহার হৃদয়ে
 প্রবেশ করিবার প্রশস্ত পথ।

৩

ভোর হইল, পথেরও শেষ হইল, আমার সাধের বাসর
 ভাঙ্গিল!

দিনের আলো চোখে পড়িতেই চৈতন্য হইল। যে জাল পায়ে
 জড়াইয়াছি, এখন তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব কি করিয়া?

ভাব্ছি—ভাব্ছি—কত কি ছাইভস্ম! কখনও আকাশে
 উঠিতেছি, কখনও চিংপাত হইয়া মাটিতে পড়িতেছি; কখনও
 দিগ্বাজি. কখনও হাবুডুবু।

না—যখন আসিয়াছি, ফেরা হইবে না। হেমের বাবার
 সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই যাইব, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় দিব।
 একটা সঙ্কোচ আসিয়া আমার অন্তর চাপিয়া ধরিল। না,
 আজ আর যাব না। আজিকার দিনটা কোন হোটেলের থাকিব!

আগামী কল্য গৌফ নিদেন দাড়ীটা কামিয়ে বাঙ্গালী হইয়া গিয়া দেখা করিব। হাঁ, তাই ঠিক। নইলে আর বাঁচিবার অন্য পথ নাই। বেহঁস্ হইয়া ভাবিতেছিলাম, তখন আমার কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ হেমের কথায় চমকিয়া উঠিয়া দেখি, গাড়ী হাওড়া প্লাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমার মুখের ভাব দেখিয়া হেম ভারী উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিল। বলিল,—“আপনার তো কোনো অসুখ করে নি?”

আমি সে কথায় কোন উত্তর না দিয়াই দরজা খুলিয়া প্লাটফর্মে নামিয়া পড়িলাম। হেম ও বৌদিকে বলিলাম,—

“আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি গাড়ী ঠিক করে নিচ্ছি।” গাড়ী ঠিক করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি, একজন বাঙ্গালী বাবু গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বুঝিলাম, ইনিই আমার ভাবী সম্বন্ধীবাবু। আমি ফিরিয়া আসিতেই, হেম বলিল,—“ইনি—ওঁর জ্ঞেই আমরা এ বিপদে রক্ষা পেয়েছি।”

হেমের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। আমাকে বলিল,—
“ইনিই আমার বড়দাদা!”

আমি বড়দাকে নমস্কার করিলাম। তিনিও প্রতি নমস্কার করিলেন। এবার হিন্দী ও ইংরাজী মিশাইয়া আমাকে সম্বোধন এবং অপ্যায়িত করিলেন। অতঃপর বলিলেন,—“আপনি আমার ভাই—ভাইয়ের চেয়েও বেশী।” বলিয়াই আমার করমর্দন করিলেন।

আমি বলিলাম,—“আমায় যখন ভাই বলে গ্রহণ করেছেন, তখন আশা করি, আমায় আর কোনরূপ ধন্যবাদাদি দিয়া লজ্জিত

করিবেন না। যদি করেন, তবে বুঝুন, আপনি মুখেই কেবল ভাই বলিতেছেন, অন্তরে গ্রহণ করেন নাই।”

আমার কথায় শালাবাবু তার বুকের মধ্যে আমার টানিয়া লইলেন।

জিনিষপত্র গাড়ীতে তোলা হইল। হেম ও বৌদি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। আমি আমার হাতব্যাগ হাতে ও বিছানাটুকু বগলে করিতেই বড়দা আমার হাত ধরিলেন,—“দিন, আমাকে একটা দিন।”

আমি তাঁহাকে বাধা দিলাম। বলিলাম,—“এইবার তবে বিদায় দিন।”

“সে কি! চলুন আমাদের বাড়ীতে।”

“যাব বই কি,—নিশ্চয়ই যাব। তবে এখন মাপ করবেন। আমাকে এখনই গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। তাঁরা অপেক্ষায় আছেন, এই গাড়ীতেই আমি যাব।”

“না—না—না, সে হবে না। আগে আমাদের বাড়ী, তার পর সেখানে।”

“যদি এখনিই না যাই, তবে হয় তো তাঁরা একটা কাণ্ড করে বসবেন। হয় তো লাহোরে টেলিগ্রাম করে বসবেন। যা সে টেলিগ্রাম পেলে ভারী চিন্তিত হয়ে পড়বেন। আমি বিকালে আপনাদের বাড়ী যাব।”

“আপনাকে না নিয়ে গেলে বাবা আমার উপর ভারী অসন্তুষ্ট হবেন।”

“আপনি তাঁকে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বললে, তিনি

কিছু বলবেন না। আপনার বাবাকে আমার প্রণাম জানাবেন।”

“সত্যিই এখন আসবেন না?”

“যদি সাধ্য থাকত তো এই মুহূর্তেই যেতুম।”

“ঠিক বলুন, কখন যাবেন?”

“বিকালে।”

“আপনার ঠিকানা বলুন, আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব।”

মহা বিপদে পড়িলাম। ভাবিলাম একটা যা’ তা’ ঠিকানা বলিয়া দিই। কিন্তু মিথ্যা চের বলিয়াছি, আর বলিতে সাহস করিলাম না। বলিলাম—

“আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি বিকালেই যাব।”

“ঠিক? আমাদের বাড়ীর ঠিকানা হচ্ছে—”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—

“আমি তা জানি। আমি আপনার ভগ্নীর নিকট হ’তে ছেনেছি, আপনাদের টেলিগ্রাম করতে দরকার হয়েছিল। তবে এখন আসি। হাঁ, আপনার পুরো নামটি কি, বলুন তো?”

“শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।”

পকেট হইতে নোটবহি বাহির করিয়া লিখিয়া লইলাম। লিখিলাম, “শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আমার বড় শ্যালক)।”

বড়দা ক্ষুধমনে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। আমায় তাঁহার সঙ্গে না দেখিয়া হেম গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল ও দাদার সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা হইল। আমি দেখিলাম, হেম মাথা নাড়িয়া

যেন কোন কথার প্রতিবাদ করিল। করিয়াই দ্রুত আমার দিকে আসিতে লাগিল! আমি হেমকে যেন দেখিয়াও দেখিলাম না। ধীরে যাত্রা করিলাম। হেমও একেবারে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অভিমানভরা মুখে মুহূর্তমাত্র চাহিল। সব বুঝিলাম। হেম আমাকে নিতে এসেছে। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “কোথায় যাচ্ছেন শ্রী, চলুন আমাদের বাড়ী। আপনি যদি না যান, তবে আমরাও যাব না।”

আমি ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি বলিব, কি করিতে হইবে, ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু কতক্ষণ এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা চলে! আমার নকল করি বিসর্জন দিলাম। বলিলাম, “আমি বাঙ্গালী। আমার যদি ক্ষমা করেন, তবে যাব, নইলে যাব না—আমি তোমাকেই দেখতে এসেছিলুম, ভগবান তোমায় আমাকে দেখায়েছেন। তবে আমি আসি? আর তুমি যদি আমার ক্ষমা কর, আসতে বল, তবে আবার আসব।”

হেম থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; মুখ লাল হইয়া গেছে। মাথা নীচু করিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

হেমের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “এসো,—তোমার আসতেই হবে।”

আনন্দে আমার সর্কশরীর শিহরিয়া উঠিল। হেম তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়া উঠিল। আমিও ভিড়ের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলাম।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই,—সর্বোৎকৃষ্ট।

—সাম্প্রতিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তকপাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব ‘আট-আনা-সংস্করণ’ প্রকাশ করিয়াছি।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

মফস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। প্রকাশিতগুলি একত্র বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী পৃথক পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাগুলের হার বৃদ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৫০ লাগিবে। অ গ্রাহকদিগের ৫/০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, “গ্রাহক-নম্বর” সহ পত্র দিতে হইবে।

- ১। অভাগী (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
- ২। ধর্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৩। পল্লীসমাজ (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ৪। কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- ৫। বিবাহবিপ্লব—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল।
- ৬। চিত্রালি—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ৭। দুর্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

- ৮। শাশ্বতভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় ।
- ৯। বড়বাড়ী (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন ।
- ১০। অরক্ষণীয়া (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।
- ১১। ময়ূখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ ।
- ১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ।
- ১৩। রূপের বানাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় । (২য়সং-ষষ্ঠস্থ)
- ১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ।
- ১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনা দেবী ।
- ১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ।
- ১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
- ১৮। নকল পাঞ্জাবী (৩য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ।
- ১৯। বিঘ্নদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত । (২য় সং—ষষ্ঠস্থ)
- ২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্কাধিকারী (২য়সংষষ্ঠস্থ)
- ২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ।
- ২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল ।
- ২৩। সুখের ঘর (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ ।
- ২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী । (২য় সং—ষষ্ঠস্থ)
- ২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী ।
- ২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দ্রা দেবী । (২য় সং—ষষ্ঠস্থ)
- ২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ।
- ২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু ।
- ২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম,এ ।
- ৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী ।
- ৩১। নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ ।
- ৩২। হিসাব নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্ ।
- ৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ।
- ৩৪। ইংরাজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম,এ ।
- ৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ।
- ৩৬। শযতানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ।

- ৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই ।
 ৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী—(তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন ।
 ৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম এ ।
 ৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার এম, এ ।
 ৪২। পল্লীরাগী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ।
 ৪৩। ভবানী—৩নিত্যকৃষ্ণ বসু ।
 ৪৪। অমিয় উৎসব—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ।
 ৪৫। অপরিচিতা—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ ।
 ৪৬। প্রত্যাবর্তন—শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ।
 ৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল ।
 ৪৮। ছবি—(২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।
 ৪৯। মনোরমা—শ্রীসরসীবালা বসু ।
 ৫০। সুরেশের শিক্ষা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ ।
 ৫১। নাচ ওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এ ।
 ৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ ।
 ৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
 ৫৪। দেওয়ানজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ।
 ৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর—(দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন ।
 ৫৬। গৃহদেবী—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ।
 ৫৭। হৈমবতী—শ্রীচন্দ্রশেখর কর ।
 ৫৮। বোঝা পড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব ।
 ৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ।
 ৬০। হারাণ ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্মা ।
 ৬১। গৃহ-কল্যাণী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল ।
 ৬২। সুরের হাওয়া—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এম্-সি ।
 ৬৩। প্রতিভা—বরদাকান্ত সেনগুপ্ত ।
 ৬৪। আত্রেয়ী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি-এল ।
 ৬৫। মেডী ডাক্তার—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম, এ ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

